সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(A Short History of Sociological Thought)

সমীর দাশগুপ্ত
অধ্যাপক
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

SAMAJTATWIK CHINTADHARAR SANKHIPTA ITIHAS
By Samir Dasgupta

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮০ ।

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা—৭০০০১৩

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রশান্ত হাজরা

মুদ্রক : কল্পতরু প্রেস,
৪১/২, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা—৭০০০১৯ ।

Pub'ished by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New-Delhi.

মা ও বাবার উদ্দেশ্যে

যাঁদের কাছে ঋণী

বাংলাভাষায় সমাজতত্ত্বের চর্চা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেনি যদিও বহুকাল আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। অধ্যাপক খগেন সেন এবং অধ্যাপক পরিমলভূষণ করের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই বাংলা ভাষায় সমাজতত্ত্ব চর্চার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ম্যাক্স হেবার, ডুরখ্যাইম্ কিংবা অগাস্ত কোঁত প্রমুখ প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সমাজতত্ত্বের চর্চা করেছিলেন। দু'শো বছরের বিদেশী শাসন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত স্তরে ইংরেজি ভাষার যে প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল তার ফলে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ভাব বিনিময় কিংবা ধারণা ও জ্ঞানের আদানপ্রদান সহজতর হ'ত না। বিদেশী ভাষার ওপর আর নির্ভর না করে মাতৃভাষায় যে কোন বিষয়েরই চর্চা করবার সময় অনেকদিন হ'ল এসে গিয়েছে। এমন ভাবনায় প্রণোদিত হয়েই পুস্তকটি বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করতে ব্রতী হয়েছি। আমার পরমারাধ্য মা, বাবা, পিসি, কাকামণি ও ছোটমা'র উৎসাহ এবং আশীর্বাদই আমার বর্তমান প্রচেষ্টার একমাত্র মূলধন। আমার সফলতার আর এক দাবীদার আমার স্ত্রী যার উৎসাহ আমাকে এই বই লিখতে যথেষ্ঠ প্রেরণা দিয়েছে। আমার পরম বন্ধুবর অধ্যাপক পূজন সেন, কলকাতা কর্পোরেশনের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা এবং 'Calcutta Municipal Gazette' ও 'পুরশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায় আমাকে যেমন প্রতি পদক্ষেপে উৎসাহ দিয়েছেন তেমনি যথেষ্ট মানসিক শক্তিও যুগিয়েছেন। আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ডঃ অলককুমার মজুমদারও এই বইটি লেখার ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। বইটি লেখবার প্রথম পর্যায়ে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ বেলা দত্তগুপ্তাও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। বইটি অবশ্য পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত এবং মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্পর্শে বইটি প্রকৃতপক্ষেই মর্যাদা লাভ করেছে। তবে এই বইটি প্রকাশিত হবার খবর পেয়ে যাঁরা খুব খুশী হয়েছেন তাঁরা হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার সেন এবং গণিত বিভাগের অধ্যাপক প্রাণরঞ্জন সেনগুপ্ত।

সবশেষে পুস্তক পর্ষদের অধিকর্তা অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী পর্ষদের কর্মীবন্ধুদের বইটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করবার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ভুল ত্রুটী হয়ত আছে—হয়ত আরও উচ্চমানের করে বইটিকে লেখা যেত। এ সব কিছু ত্রুটীবিচ্যুতি স্বীকার করেই পাঠকের এবং সমালোচকের মূল্যবান সমালোচনা কামনা করছি যাতে বইটির পরবর্তী সংস্করণকে সহজতর এবং আরও উচ্চমানের করে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে।

সমীর দাশগুপ্ত

নভেম্বর, ১৯৮০

সূচীপত্র

ভূমিকা ও পরিকল্পনা

সমাজতত্ত্ব বিষয়টি ভারতবর্ষে নতুন না হলেও একেবারে পুরোনো নয়। বিষয়টির পঠন-পাঠনের আরম্ভকাল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ এবং ক্ষেত্র বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যে ষাটটি বছর কেটে গেছে; বিষয়টি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রসারও লাভ করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টির চর্চাও সুরু হয়েছে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে। ভারতবর্ষের পটভূমিকায় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন প্যাট্রিক গেডেজ, জি. এস. ঘুড়িয়ে, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম. এন. শ্রীনিবাস, রামকৃষ্ণ মুখার্জী, কে. এম. কাপাদিয়া প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতত্ত্বের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে এবং তা অক্ষুন্ন রাখতে যাঁরা গবেষণার সাধনায় এখনো নিমগ্ন তাঁরা হলেন এস. সি. দুবে, এ. আর. দেশাই, যোগিন্দার সিং, বেলা দত্তগুপ্তা, লীলা দুবে, ডি, সুজা, আন্দ্রে বেতাই, এ. এম. শা প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির ঐতিহ্য স্বীকৃত হয়েছে ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণা এবং তৎসম্পর্কিত চিন্তাধারার ওপর আশ্রয় করে। আমাদের দেশের সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যেও পাশ্চাত্য গবেষণার ছাঁচ যে রয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। তবে সুখের কথা এই যে প্রায় প্রত্যেকেই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ভারতবর্ষের সমস্যা এবং ঐতিহ্যকেই বেছে নিয়েছেন। হয়ত এখনো পর্যন্ত তেমন কোন "সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়" ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে গড়ে ওঠেনি যা বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত হয়েছে তবুও গবেষণার মাধ্যমে হয়ত তেমন কোন প্রত্যয় গড়ে

উঠতে পারে এই আশা নিয়েই সমাজতাত্ত্বিকেরা গবেষণা চালাচ্ছেন।

পাশ্চাত্য দেশে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি তিনটি যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ সময় ও কালের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা কেউই সঠিক অর্থে সমাজতাত্ত্বিক নন, কিন্তু, সমাজতত্ত্ব বিষয়টি জন্ম দেওয়ার নেপথ্যে তাঁদের ভূমিকা অপরিসীম। প্লেটো, এরিস্‌টটল্‌, অগাস্‌টাইন, টমাস মুর, আইবান কলদুন, মার্কাস সিসারো, রুশো, ভলতেয়ার, কনডোরসেট, ম্যনতেসকু প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদের নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের অবশ্য সূচনা হয়েছিল আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে। এডাম ফার্গুসন, সেন্ট সাইমন, ডি টোকভিল প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে এগিয়ে দিলেন উত্তরণের পথে এবং অগাস্ত কোঁত্‌ হলেন প্রথম সমাজতাত্ত্বিক যিনি বিষয়টিকে পূর্ণতার মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়, কাল ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠলো সমাজতত্ত্ব বিষয়টির নানান প্রত্যয়—গড়ে উঠলো বিভিন্ন মতবাদ এবং চিন্তাধারা। হারবার্ট স্পেনসার, এমিল ড্যুরখ্যাইম, ফ্রেডারিক লে প্লে, ম্যাক্স হেবার, কার্ল মার্কস, টয়েনিজ, জর্জ সিমেল, ভিলফ্রেডো প্যারেটো, কার্ল ম্যানহাইম্‌, ভন্‌ ভিজে, ফ্র্যাঙ্কলিন গিডিংস প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক স্বীকৃতি পেলেন প্রবক্তা হিসেবে। প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠলো মতবাদ এবং মতবাদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠলো চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্র। প্রত্যক্ষবাদ, জৈবিক-সামাজিক বিবর্তনবাদ, কার্যনির্ভর সমাজতত্ত্ব, গঠননির্ভর মতবাদ, যুতসিদ্ধ মতবাদ, আচরণনিষ্ঠ মতবাদ, সংঘাতনিষ্ঠ মতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারারই ফসল। যাই হোক সমাজতত্ত্বের এক দীর্ঘ ইতিহাস যে বর্তমান গবেষণাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীনিষ্ঠ পথে পরিচালিত করছে সে

॥ তিন ॥

বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে ধারণার সঙ্গে ঘটনার, দর্শনের সঙ্গে সংস্কারের এবং তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধনই হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিকের মূল দায়িত্ব। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন—তত্ত্ব রচনা করেছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা সাপেক্ষে সূত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে তত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং মতপার্থক্য সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে বিদ্যমান। তত্ত্ব যদি বিশেষ কোন কালের এবং সময়ের ভাষা হয় তবে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের কোন সার্বজনীন স্বীকৃত মতবাদ না থাকাটাই স্বাভাবিক এবং সমাজতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সে কথাই প্রমাণিত হয়। যাই হোক সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক এবং যাঁরা উত্তরসূরী তাঁদের গবেষণার দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজতত্ত্বের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কারণ সমাজতত্ত্বের যাঁরা ধারক এবং বাহক তাঁদের চিন্তাধারার সমীক্ষা না করলে বর্তমানের কোন গবেষণাভিত্তিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইতিহাস হ'ল বর্তমানের কম্পাস যা ভবিষ্যতের দিগ্‌নির্ণয় করতে সাহায্য করে। ফলে, সমাজতত্ত্বের ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত হয় বর্তমানের সমাজতাত্ত্বিক ধারণা এবং প্রত্যয় যা ভবিষ্যতের সমাজতত্ত্বকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কি ছিলাম, কি হয়েছি এবং কি হ'ব—এই তিনটি প্রত্যয় নিয়েই সমাজতত্ত্ব এবং এই সূত্রে সমাজতত্ত্বের ইতিহাস জানবার গুরুত্ব অপরিসীম। যাই হোক সমাজতত্ত্বের ইতিহাস এত বিশাল এবং ব্যাপক যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিভিন্ন মতবাদ এবং তত্ত্ব কখনো কখনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কিংবা দেখা যায় কোন একজন সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন মতবাদের পৃষ্টপোষক। সর্বোপরি সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের কোন সুসংহত বিন্যাস এখনো পর্যন্ত করে ওঠা সম্ভব হয়নি। উপরোক্ত বাদবিসম্বাদ এড়ানোর জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে সমাজতত্ত্বের এক

সুসংহত ইতিহাস (যতখানি করা যায়) পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। যাদের কথা তুলনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে তাঁদের তত্ত্ব এবং ধ্যানধারণার গভীরতার মধ্যে না গিয়ে উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। যাঁরা সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা বলে স্বীকৃত অর্থাৎ অগাস্ত কোঁত্, হারবার্ট স্পেনসার, ভিলফ্রেডো প্যারেটো, এমিল দ্যুরখ্যাইম্, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স হ্বেবার, কার্ল ম্যানহাইম্, ফ্র্যাঙ্কলিন গিডিংস প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের অবদান সম্পর্কিত (তত্ত্ব, ধ্যানধারণা এবং প্রত্যয়) আলোচনা বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশের বহু সমাজতাত্ত্বিকের মধ্যে আর যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সমাজতাত্ত্বিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী এবং অবদান খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই নমুনা মেনে চলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ একথা অনস্বীকার্য যে মতবাদ-ভিত্তিক অনুশীলনকেন্দ্র নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকের মধ্যে বিতর্ক লেগেই আছে। তাই পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করবার নিমিত্তে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকের (যথা সোরোকিনের শ্রেণীবিভাগ, মার্টিনডেলের শ্রেণীবিভাগ, আব্রাহামের শ্রেণীবিভাগ) মতবাদভিত্তিক এবং দেশ ও কালভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের খসড়া উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান (যথা অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি) নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার উল্লেখ করে তৎসম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিকগণের নামোল্লেখ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ঐতিহ্য খুঁজে না পাওয়া গেলেও যতখানি সম্ভব উপরোক্ত নমুনা খসড়া মেনে চলা হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেও যেমন বিভিন্ন সমাজচিন্তাবিদ্‌গণের (প্লেটো, এরিস্‌টটল, ম্যাকিয়াভেলি, বেনথাম্, ফার্গুসন, কনডোরসেট, টোকভিল, ম্যানতেসকু, রুশো এবং

ভলতেয়ার, বেকন, ডিমোক্রিটাস প্রমুখ) নামোল্লেখ না করে কেউই পারেন নি (অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার পেছনে নিশ্চয়ই এদের অবদান এবং ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ) তেমনি এই সত্য ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার উন্মেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সমস্ত সমাজচিন্তাবিদ্ (কৌটিল্য, মনু, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ) বিষয়টিকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন এবং যাঁদের অবদান নিঃসন্দেহে সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন তাঁদের কথাও অল্প বিস্তর বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এঁরা কেউই সঠিক অর্থে সমাজতাত্ত্বিক নন (অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব বিষয়ের লোক নন) তবুও একথা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য যে সমাজ সম্বন্ধীয় আলোচনার মাধ্যমে এঁরা সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন।

আশা করা যায় সমাজতত্ত্বের ইতিহাস জানা থাকলে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্র যেমন জানা সম্ভব হবে তেমনি চিন্তাধারার বৈচিত্র্য এবং সমাজতত্ত্বের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কেও কিছু প্রাথমিক ধারণা জন্মাবে। শুধু তাই নয় মাতৃভাষায় যে কোন বিষয়ের চর্চা করলে ধারণা যেমন পরিস্কার হয় গবেষণার ক্ষেত্রও বিস্তৃত এবং সুসংহত হতে পারে। একথা মানতেই হবে যে প্রত্যেক দেশে সমাজতত্ত্বের চর্চা, পঠন-পাঠন, গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা হয়েছে স্ব-স্ব মাতৃভাষায়। আগেই বলেছি মাতৃভাষায় ভাবের আদান প্রদান যতটা না সম্ভব বিদেশী ভাষায় জ্ঞানের পরিধি ততখানি বিস্তৃত হওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত ধারণাকে মনে রেখে গ্রন্থখানি বাংলাভাষাতেই রচনা করতে ব্রতী হয়েছি।

পরিশেষে বলি বিশাল এক সমাজতত্ত্বের ইতিহাস এত ক্ষুদ্র পরিসরে লেখা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বিস্তৃতভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করাও কঠিন কারণ সমাজতত্ত্বের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই

বিতর্কিত এবং পরিবর্তনশীল। মূল কথা হ'ল সমাজতত্ত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক ধারণা জন্মানোই এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

৩০শে মে। ১৯৮০

অধ্যাপক সমীর দাশগুপ্ত
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়॥
পশ্চিমবঙ্গ।

প্রথম অধ্যায়

সমাজতত্ত্বের ইতিহাস : পাশ্চাত্য ভাবনা

সমাজতত্ত্বের ইতিহাস : পাশ্চাত্য ভাবনা

মানবজাতির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা হল 'সমাজ' যাকে বাদ দিয়ে মানবজাতির অস্তিত্ব বোঝাই সম্ভব নয়। মানুষের পরিচয় সমাজের প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ "মান" এবং "হুঁসের" একমাত্র ক্ষেত্র হোল সমাজ যেখানে মানুষের বিচারে মানুষের অস্তিত্ব, ব্যবহার এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। সমাজতত্ত্ব বিষয়টি স্বভাবতই সমাজ এবং মানবজাতির পারস্পরিক সমঝোতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর একটু ভেঙ্গে বললে বলা যায় যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যা মানুষের আচার, আচরণ, ব্যবহার, ন্যায়নীতি এবং সর্বোপরি অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র হাতিয়ার সে কথাই সমাজতত্ত্বের একমাত্র আলোচ্য বস্তু। এককথায় বলা যায় সমাজের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উত্থান পতন কিংবা তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং তার সমস্যা যার ওপর সমাজ কথাটির অস্তিত্ব বিদ্যমান সে কথার আলোচনা নিয়েই সমাজতত্ত্ব।

ধারণার সঙ্গে ঘটনার, দর্শনের সঙ্গে সংস্কারের এবং তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধনাই হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিকের মূল দায়িত্ব। অবশ্য সমাজতত্ত্ব বিষয়টির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের (অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি) এমন এক যোগসূত্র রয়েছে যে সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে আলাদা করে ভাবা সত্যিই খুব কঠিন। তবুও একথা ঠিক সমাজতত্ত্বের এক স্বকীয় বিষয়বস্তু এবং ভাবধারা রয়েছে। রানচিম্যানের মতে দুই ধরণের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠেছে আপন মহিমায় : (ক) বিবর্তনবাদ এবং (খ) দৃষ্টবাদ। তাছাড়া তিনি মোটামুটি সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য (২) অর্থনৈতিক

ঐতিহ্য (৩) শাসন এবং সংস্কার সম্পর্কিত ঐতিহ্য এবং (৪) সামাজিক সমীক্ষা সম্পর্কিত ঐতিহ্য। যাই হোক রানচিম্যানই প্রথম যিনি বলতে চেয়েছিলেন—"সমাজতত্ত্বের এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাবনার স্বকীয়তা রয়েছে"।

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফলে তত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং মতপার্থক্য যথার্থই সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে বিদ্যমান। একথা যদি সত্য হয় যে তত্ত্ব হল বিশেষ বিশেষ সময়কালের ভাষা তাহলে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন চিন্তাধারার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকবেই। তবে একথা ঠিক ইতিহাস না জানলে বর্তমানের দর্শনকে উপলব্ধি করা যায় না। আবার দর্শন না জানলে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারার বিভিন্নতা—ভাবনার এবং দর্শনের ইতিহাস যেমন জানার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সমাজতত্ত্বের যাঁরা ধারক এবং বাহক অর্থাৎ যাঁরা সমাজতত্ত্বের দর্শনকে প্রতিফলিত করেছেন তাঁদের ভাবনাকে প্রতিফলিত না করলে সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের সুসংহত দর্শন জানা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বর্তমান কালের গবেষণার ভিত্ গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। ডন মার্টিনডেল্ সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারার ইতিহাসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন।

ক) দৃষ্টবাদ সম্পন্ন জৈবিক তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ:—

যাঁরা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন লিলিয়েনফিল্ড, স্ক্যাফেল, রেনী ওয়ার্মস, টয়েনিজ, ড্যুরখ্যাইম, রেডফিল্ড, প্যারেটো, ফ্রয়েড, স্পেঙ্গলার, টয়েনবি, সোরোকিন, ল্যুণ্ডবার্গ প্রমুখ।

খ) সংঘাত তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ:—

এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন পলিবিয়াস্, আইবান্ কলদুন, ম্যাকিয়াভেলি, বডিন্, হবস্,

হিউম, ফার্গুসন্, এডামস্মিথ, ম্যালথাস্, হেগেল, কার্ল মার্কস, ডারউইন, ওয়াল্টার বেজহট, ল্যুডউইগ গুমপ্লুইজ, র‍্যাট জেনোফার, অ্যালবিওন'স্মল, ওপেনহাইমার, জর্জ ভোল্ড প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

গ) **লৌকিক তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ :—**

এই মতবাদ যাঁরা প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন কাণ্ট, রেনেভার, হাজারেল, সান্ত্যায়ানা, রুডলফ ষ্ট্যামলার, জর্জ সিমেল, সেলিষ্টিন বাগ্ল, ই. আর. রস, পার্ক এবং বার্জেস, লিওপোল্ড ভন্ ভিজে, হ্যান্স কেল্সেন, ভিয়ারখন্দ, ম্যাক্স স্কেলার, গারভিচ্, প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

ঘ) **সামাজিক আচরণনির্ভর তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ :—**

এই মতবাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁরা হলেন ফেচনার, জে. রয়েস উণ্ড, ডব্ল্যু জেমস, জন ডিউই, গ্যাব্রিয়েল টারডে, গুস্তাভ্ লি-বন্, মার্ক বল্ডউইন, ফ্র্যাঙ্কলিন গিডিংস, ই. রস, অগবার্ণ এবং নিমকফ, ষ্টুয়ার্ট চ্যাপিন, উইলিয়াম জেমস্, কুলি, ডব্ল্যু টমাস্, জর্জ হারবার্ট মিড, ই, ক্যাসাইরার, জাঁ পিয়াগেট, গার্থ এবং মিলস্, ম্যাক্স হেবার, ভেবলেন্, ম্যাকাইভার, কার্ল ম্যানহাইম্, ফ্লোরিয়ান জানিয়েকি, ট্যালকট পারসনস্, রবার্ট মার্টন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

ঙ) **কার্যনির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ :—**

এই মতবাদের যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন রবার্ট ব্রাউন, মালিনোভ্স্কি, ফ্লোরিয়ান জানিয়েকি, জি. সি. হোমানস্, ট্যালকট পারসনস্, ম্যারিয়ন লেভি, কার্ট লিউইন্ প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

সোরোকিন অবশ্য সমাজতাত্ত্বিক মতবাদকে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত মতবাদভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ এই সূত্রে উল্লেখ করছি।

ক) যুতসিদ্ধ সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ :—

যাঁরা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে তিনি পারসো, বার্কলে, ফুঁরিয়া, ক্যারে, ব্যাকটেরেফ্, ওসট্ওয়াল্ড প্রমুখের নাম উল্লেখ করেন।

খ) ভৌগলিক মতবাদ :—

গ) জৈবিক মতবাদ সম্পর্কিত চিন্তাধারা :—

এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন লিলিয়েনফিল্ড, এ. স্ক্যাফেল্, রেনি ওয়ার্মস, জে. নোভিকাউ প্রমুখ।

ঘ) নৃতাত্ত্বিক মতবাদ সম্পন্ন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা :—

এই মতবাদের যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আর্থার ডি গোবিনিউ, জি. ভি. লাঁপাউজ, অটো আমন, জি. হ্যান্সেন, চার্লস ডারউইন, ফ্র্যান্সিস গ্যালটন, কার্ল পিয়ারসন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

ঙ) যুদ্ধ সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা :—

যাঁরা যুদ্ধ সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন নোভিকাউ, ভ্যাকারো প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক।

চ) জৈবিক সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব :—

এই মতবাদের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা হলেন অ্যাডলফ কোষ্টি, আর. পিয়ার্ল, ম্যালথাস, এম. কোভালোস্কি প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

ছ) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ :—

যে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী এই মতবাদের ভিত্তিতে তত্ত্ব পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবার্টি, এসপাইনাস্, চার্লস কুলি, ডুরখ্যাইম, গুমপ্লুইজ্, ওপেনহাইমার প্রমুখ।

জ) লৌকিকতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ :—

এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন সিমেল, ভিয়ারখন্দ, ভিজে প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

ঝ) অর্থ নৈতিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ :—

এই মতবাদে বিশ্বাসী উল্লেখ্য সমাজবিজ্ঞানী হলেন থুসিডাইডিস্, প্লেটো, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স হেবার এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।

ঞ) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ :—

এই মতবাদের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা হলেন গ্যাব্রিয়েল টারডে, ম্যাকডুগল, অলপোর্ট, লেষ্টারওয়ার্ড প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

আব্রাহাম অবশ্য এই ধরণের কোন চিন্তাধারা ভিত্তিক সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের পর্যালোচনা করেন নি, তিনি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিকদের মতবাদ সম্পর্কিত ক্রমবিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। আব্রাহাম নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন দেখিয়েছেন।

১) প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সমাজতত্ত্ব :—

যাঁরা সেই সময়কালে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা হলেন প্লেটো, এরিষ্টটল, আইবান্ কলদুন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

২)

এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য সমাজবিজ্ঞানীরা হলেন ম্যনতেসকু, রুশো প্রমুখ।

৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর (প্রথম পর্য্যায়) সমাজতত্ত্ব :—

এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য সমাজবিজ্ঞানীরা হলেন কোঁত্, টোকভিল, দ্যুরখ্যাইম প্রমুখ।

৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর (দ্বিতীয় পর্য্যায়) সমাজতত্ত্ব :—

এই শতাব্দীতে যাঁরা সমাজতত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার

দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন স্পেনসার, কার্ল মার্কস্, টয়েনিজ, ম্যাক্স হেবার, জর্জ সিমেল প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

৫) **বিংশ শতকের সমাজতত্ত্ব ঃ—**

যাঁরা আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার প্রবক্তা তাঁরা হলেন সামনার, কুলি, এবং মার্গারেট মিড।

৬) **বিংশ শতকের সমাজতত্ত্ব**

যাঁরা আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের পৃষ্টপোষক এবং প্রবক্তা তাঁরা হলেন সোরোকিন, প্যারেটো, লিনটন, পারসনস্, রবার্ট মার্টন, মিলস্ প্রমুখ।

৭) ফরাসী, ইংলণ্ড এবং জার্মানীতে যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের দরবারে খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন মার্শাল মস্, মালিনোভস্কি, রেডক্লিফ ব্রাউন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা মূলতঃ দুটি পরিষ্কার খাতে বইছে (ক) দর্শননিষ্ঠ তত্ত্ব এবং (খ) প্রয়োগনিষ্ঠ তত্ত্ব। যাই হোক মোটামুটি একথা পরিষ্কার করে বলা যায় যে সমাজতত্ত্ব যেহেতু সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়ের সঙ্গে এক যোগসূত্রে গ্রথিত সেইহেতু বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান বিষয়নির্ভর চিন্তাধারাই মূলতঃ সমাজতত্ত্বের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। কেউ কেউ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোয় সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন—কেউ বা অর্থনীতির দর্পণে সমাজকে দেখেছেন—কেউ কেউ নৃতত্ত্বের ছায়ায় সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন আবার কেউ বা দর্শন কিংবা মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে সমাজকে পর্যালোচনা করেছেন। তাই সমাজতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সহজ করে পর্যালোচনা করবার নিমিত্তে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা হল ঃ—

১) দর্শন নির্ভর চিন্তাধারা

২) রাষ্ট্রনীতি নির্ভর চিন্তাধারা
৩) অর্থনীতি নির্ভর চিন্তাধারা
৪) ইতিহাস নির্ভর চিন্তাধারা
৫) মনস্তত্ত্ব নির্ভর চিন্তাধারা

দর্শন নির্ভর চিন্তাধারা :—

দর্শন ছাড়া সমাজতত্ত্ব বিষয়টি ভাবা একেবারেই সম্ভব নয়। দর্শনই হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। ডিমোক্রিটাস, বেকন, প্লেটো, এরিসটটল, একুইনাস্, দান্তে থেকে স্বরু করে সেন্ট সাইমন, কোঁত, কার্ল ম্যানহাইম্, জর্জ গারভিচ প্রমুখ দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক এই মতবাদের প্রবক্তা। কোঁত প্রবর্তিত "দৃষ্টবাদ" এবং "মনুষ্যতত্ত্বের ধর্ম" সম্পর্কিত প্রত্যয় দর্শন নির্ভর সমাজ-তাত্ত্বিক চিন্তাধারারই ফসল। জেমস্ও কোনেলের "Vestiges of Civilization", ক্যালভিন ব্লান্চার্ডের "Essence of Science, or the Catechism of Positive Sociology and Physical Mentality", ফ্রেডারিক হল্মসের "The Science of Society", এল. এ. ওয়েবষ্টারের "Present Status of the Philosophy of Society", আর. জি. রাইটের "Principia, or Basis of Social Science" প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থ দর্শননিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আদি প্রেরণা। দর্শননিষ্ঠ সমাজতত্ত্বের চর্চার উৎস শুধুমাত্র যে প্রাচীন যুগ সে কথা বললে ভুল হবে। আধুনিক যুগের সমাজতত্ত্বের কক্ষপথেও দর্শনের প্রভাব রয়েছে। ডানকান মিচেলের ভাষায়, "Sociology is still both Philosophical and Practical, both concerned with Society……it is both encyclopaedic and piecemeal in its approaches…"

রাষ্ট্রনীতি নির্ভর চিন্তাধারা :—

রাজনৈতিক কার্যনীতি এবং গড়ন সমাজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

কতখানি যোগসূত্রে বাঁধা সেই তত্ত্বই সাধারণতঃ রাষ্ট্রনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্বে আলোচিত হয়। রাষ্ট্রনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে প্লেটো এবং এরিসটটলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরিসটটল মানুষকে "a political animal" বলে অভিহিত করেছেন। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Republic"-এর এক অধ্যায়ে লিখেছেন, "......And when we have got hold of enough people to satisfy our many varied needs, we have assembled quite a large number of Partners and helpers together to live in one place; and we give the resultant settlement the name of a community or state." তবে আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনীতি নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ম্যানতেসকুর নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় যিনি "Rational Politics" প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। এ ছাড়া এডমণ্ড বার্ক ('Works') টম পেইন ("Dissertation on the First Principles of Government"), ল্যুইস ডি বোনাল্ড, জোসেফ ডি মাস্ত্রা, হারডার, ফ্রেডারিক স্কেলিং, হেগেল প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদ রাষ্ট্রনীতি নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আদি প্রেরণা। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে কার্ল মার্কস, (শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব), ম্যাক্স হেবার (কর্তৃত্ব এবং আমলাতন্ত্রের কাঠামো), এডওয়ার্ড শীলস্ (The Torment of Secrecy), এইচ. আইজেনক্ (Psychology of Politics), টি. ডি. ওয়েলডন (The Vocabulary of Politics), জে. এস. কোলমেন (The Politics of the Developing Areas) এবং ম্যাকাইভার (The Modern State, The Web of Government) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অর্থনীতি নির্ভর চিন্তাধারা :—

মানবজীবনের অর্থনৈতিক আচরণ এবং সামাজিক উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিকনিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা। স্মেলসারের ভাষায়, "Economic Sociology is the application of the general frame of reference, variables and explanatory models of Sociology to that complex of activities concerned with the production, distribution, exchange, and consumption of scarce goods and Services." এই মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে কার্ল মার্কসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যিনি বলেছিলেন, "The totality of (the) relations of production constitutes the economic structure of society........" মার্কস ছাড়া আর যাঁরা এই বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন কেনিস (General Theory of Employment, Interest and Money), এডাম স্মিথ (Wealth of Nations), হুারখ্যাইম্ (The Division of labour in Society), ম্যাক্স হেবার (The Theory of Social and Economic Organisation), লোরিয়া, এফসিঁমিয়া, ডব্ল্যু সোমবার্ট, কে. বুচার, হব্সেন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

ইতিহাস নির্ভর চিন্তাধারা :—

অতীতের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের সামাজিক গড়ন ও কার্যনীতির কথা যিনি বিশ্লেষণ করে সমাজতাত্ত্বিক ছুনিয়ায় প্রথম ইতিহাস নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ প্রবর্তন করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি হলেন জিওভান্নি বাতিস্তা ভিকো। তিনি তাঁর "La Scienza Nuova" গ্রন্থে জাতিতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক প্রগতির কথা পর্যালোচনা করেছিলেন। ভিকোর

মতে, "The essence of historical development consists of the creations and alterations in the collective mind........". ম্যনতেসকুও তাঁর "Spirit of Laws" এবং "Cause of the Greatness and Decadence of the Romans" গ্রন্থে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমাজ বিশ্লেষণের এক সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছিলেন। মানবসমাজের ওপর বাণিজ্যিক বিপ্লব কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথাই ম্যনতেসকু তাঁর মতবাদের মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছিলেন। ম্যনতেসকুর মতবাদে যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন আরনল্ড হীরিণ এবং এডাম ফার্গুসন। জোহান গট্‌ফ্রিড হারডারের বিখ্যাত গ্রন্থ "Ideas for the Philosophy of the History of Humanity" ইতিহাস নির্ভর সমাজতত্ত্বের এক বার্তাবহ। হারডারের ভাষায়, "Every Civilization buds, flowers and fades according to natural laws of growth". জার্মান দার্শনিক জোহান ফিচি ইতিহাসনিষ্ঠ সমাজতত্ত্বের আর এক প্রবর্তক। তিনি তাঁর গ্রন্থে ("Charactesistics of the present Age") যুগকে পাঁচটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করেছেন। হেগেলের "Philosophy of History" স্বাধীনতা স্বচেতনা বিশিষ্ট এবং মানব অনুভূতির সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ। হেগেলের সঙ্গে আর যাঁর নাম ইতিহাসনিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ায় জড়িয়ে আছে তিনি হলেন কার্ল মার্কস যিনি অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। অগাস্ত কোঁতের দৃষ্টবাদ নীতি ইতিহাস নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারারই ফসল। আর যাঁরা নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতি অর্জন

করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গ্যামপ্লুইজ, ('History of civil society'), ল্যুডউইগ ষ্টেইন, বেঞ্জামিন কিড্ ('Social Evolution'), এডওয়ার্ড টায়লর, ('Researches into the Early History of Mankind and the Development of civilization') হারবার্ট স্পেনসার ('The Principles of sociology') ম্যাক্স হেবার ('The protestant Ethic and the Sprit of Capitalism'), ওয়েস্টারমার্ক ('The History of Human Marriage'), ওপেনহাইমার ('The State'), বারনেস্ ('An Introduction to the History of sociology'), সি. রাইট মিলস, রেমণ্ড অ্যারন, সোরোকিন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী।

মনস্তত্ত্ব নির্ভর চিন্তাধারা :—

একদল সমাজবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনের আচার-আচরণ, মনোভাব পর্যাবেক্ষণ এবং মানবমন যা সমাজজীবনকে সুবিনস্ত কিংবা বিপর্যাস্ত করে তুলতে পারে তারই বিশ্লেষণ করেছেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ম্যাকডুগল, লি-বন, গ্যাব্রিয়েল টারডে, অলপোর্ট, লেষ্টার ওয়াড´ প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের আলোয় সমাজ-তত্ত্বের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। ফ্রয়েডের "Psycho-pathology of everyday life" কিংবা "স্বপ্ন সম্পর্কিত" তত্ত্ব এবং "ব্যক্তিত্বের" পর্যালোচনা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। অলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব, ম্যাকডুগলের প্রবৃত্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব, থারষ্টোন এবং লিকার্টের মনোভাব সম্পর্কিত সমীক্ষা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

লৌকিক সমাজতত্ত্ব :—

ক) চিন্তাধারানিষ্ঠ প্রত্যয় :—

পাশ্চাত্য দেশে লৌকিক সমাজতত্ত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসাবে স্বীকৃত। লৌকিক সমাজতত্ত্ব বলতে বোঝায় মানবজাতির পারস্পরিক

যাঁরা লৌকিক সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের মূল দায়িত্ব হল সামাজিক সম্পর্ক গঠনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করা। জর্জ সিমেলের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম এই ধরণের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়েছিলেন। অপরাপর যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন টয়েনিজ, লিওপোল্ড ফন্ ভিজে, ভিয়ারখন্দ, এলস্‌ওয়ার্থ রস্ ও হোমান্‌স।

খ) কার্যনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব :—

আধুনিক যুগে এই মতবাদের প্রাধান্য এবং গুরুত্ব অপরিসীম। একদল সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন কার্যনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব বলতে মূলতঃ বোঝায় এমন এক প্রত্যয় যেখানে প্রত্যেকটি সামাজিক উপাদানই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। রবার্ট মার্টন হলেন এই জাতীয় মতবাদের প্রবক্তা। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক মালিনোভস্কিকেও এই মতবাদের পূর্বসূরী বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আর যে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী এই শ্রেণীর চিন্তাধারাকে পাথেয় করে সমাজতত্ত্বের জগতে আলোড়ন এনেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফ্লোরিয়ান জানিয়েকি, হোমানস, ট্যালকট পারসনস্, লেভি স্ত্রাউস্, ম্যারিয়ন লেভি, কার্ট লিউইন প্রমুখ।

গ) তুলনামুলক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা :—

তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করেছিলেন বিবর্তনবাদীরা। দ্যুরখ্যাইম্ তাঁর “The Rules of Sociological method” গ্রন্থে এই ধরণের চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব বলতে বোঝায় সমাজের যে কোন অবস্থা কিংবা ঘটনা অথবা অন্য সমাজের অবস্থা কিংবা ঘটনার আলোকে কোন কিছুর পর্যালোচনা করা। অবশ্য রেডক্লিফ ব্রাউনের মতে তুলনামূলক পদ্ধতি কোন কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় না। তুলনামূলক পদ্ধতিকে শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নিরীক্ষণের একটি উপায় বলে

মনে করা যেতে পারে। অবশ্য অগাস্ত কোঁতও তাঁর "Law of three stages" এর পর্যালোচনা কালে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। হবহাউস, হুইলার এবং জিনসবার্গও তাঁদের চিন্তাধারার স্বপক্ষে তুলনামূলক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। আর যে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী তুলনামূলক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন স্যামুয়েল মার্টিন লিপসেট, রুথ বেনেডিক্স ("Social Mobility in Industrial Society" এবং "Political Man") প্রমুখ। ই. এ. ফ্রীম্যানের মতে তুলনামূলক পদ্ধতি হলো আধুনিক যুগের সফল এক পদক্ষেপ।

বুর্জোয়া ও মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ঃ—

সমাজতত্ত্বের ভাষা হ'ল সময়কালের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দেশ ও কালের ভাষারই প্রতিফলন। যুদ্ধোত্তর সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়া আজ অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু সুসংহত এবং সুসংবদ্ধ নয়। সমাজতাত্ত্বিক চর্চার বিভিন্ন স্তর যে বিভিন্নতা বহন করে চলেছে তাকে কোন এক জায়গায় এনে স্থির করে রাখা কখনোই সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমাজতত্ত্ব তার দর্শন—নির্ভর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রবেশ করেছে বিপ্লবের জগতে—প্রবেশ করেছে অর্থনৈতিক দুনিয়ায়। ১৯৫০ সাল থেকে সমগ্র পূর্ব ইউরোপের সমাজতাত্ত্বিক জগত সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতত্ত্বকে মনে রেখে যে চর্চা সুরু করেছে তা পূর্বের মূল্যবোধ বর্জিত এবং দর্শননিষ্ঠ ভাবধারায় ঠাসা সমাজতত্ত্ব থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। পূর্ব ইউরোপের সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়া নতুন করে চর্চা সুরু ক'রল মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের যা তাঁদের মতে যে কোন দেশের পক্ষেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে। যে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী যথা লুকাকস্, "Geschichte und Klassenbewusstsein" এন. বুখারিন, "Historical Materialism," এস. ওসোস্কি "Class Structure in the Sociel Consciousness," জি. ব্রীকস্,

"The Proletariat," জি. ভি. প্লেখানভ্, "The Role of the Individual in History," এইচ, মারক্যুইস, "Reason and Revolution : Hegel and the Rise of social Theory," ডেভিড গ্লাস, "Social Mobility in Britain," এস. ডব্ল্যু গোল্ডনার, "Reciprocity and Autonomy in Functional Theory," সি. জি. হ্যাম্পবেল, "The Logic of Functional Analysis" ইত্যাদি মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারার স্বপক্ষে শ্রেণী সংগ্রামের যে মূল তত্ত্ব সমাজতাত্ত্বিক চর্চার মাধ্যমে উদঘাটিত করবার চেষ্টা করেছেন সেই দ্বান্দিক মতবাদ, বিপ্লবের তত্ত্ব এবং প্রলেতারিয়েতের "বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব" যা উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে, উপরিকাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক চৈতন্য আনে সেই তত্ত্ব এবং তথ্য সমৃদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়াকে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়া বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এণ্টনীয় গ্রামস্কির ভাষায়, "contemplating all the men of the world, who come together in society to work, struggle and better themselves, cannot but please you more than any other thing". সমাজতত্ত্ব চর্চার আর একটি শিবির হ'ল বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব যার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করা হয় এবং সেই মত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়। কার্য এবং গঠন নির্ভর সমাজতত্ত্ব সেই বুর্জোয়া তত্ত্বেরই এক প্রতিবিম্ব।

সামাজিক স্তরবিন্যাস, জ্ঞানতত্ত্ব, বিবর্তনবাদ, উন্নয়ন এবং প্রগতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি শিবিরের চিন্তাধারার অনৈক্য স্পষ্ট। মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক প্লেখানভ যখন লেখেন "sociology becomes a science only to the extent to which it succeeds in understanding the

origin of aims of social man as the necessary effect of the social process conditioned in the end, by the course of economic development," বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক ষ্ট্যামলার তখন সমাজতত্ত্বের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ণয় করেন: "a special kind of science differing from natural science, that the substance of social science concerns itself with social phenomena and the characteristic peculiarities lie in the fact that they are regulated from an external stand-point, by the norms of law". সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা অগাস্ত কোঁতের তত্ত্বও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বার্তাবহ। অগাস্ত কোঁত জ্ঞানের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ বিবর্তনের ধারা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জ্ঞানের শেষ স্তর অর্থাৎ দৃষ্টবাদ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যে শিল্প সমাজের গঠন আলোচনা করেছেন তাতে বস্তুতান্ত্রিকতার ছোঁয়া যেমন নেই তেমনি শ্রেণী সংগ্রামের ইঙ্গিতও নেই। তাঁর "Religion of Humanity" মার্কসীয় দর্শনের বিপরীত এক প্রত্যয়। শিল্পায়নকে সামনে রেখে তিনি বলেছেন "with the rising production the density of population increases near industrial belts···for the industrial growth the poor (প্রলেতারিয়েত বলেন নি) would avail themselves of the educational and other social and economic opportunities........the industrial elite must have a vital role in planning, organization and direction of industrial economy". (সমীর দাশগুপ্তের "Industrial growth and social development in India" নিবন্ধ হইতে সংগৃহীত)। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন শিল্পায়নকে অর্থনৈতিক উপাদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে। মার্কসের ভাষায়, "Technology discloses man's mode of dealing with

Nature, the process of production by which he sustains his life, and thereby also lays bare the mode of formation of his social relations........In the social production which men carry on they enter into definite relations that are indispensable and independent of their will; these relations of production correspond to a definite stage of development of their material powers of production. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society—the real foundation on which rise legal and political super-structures and to which correspond definite forms of social consciousness". মার্কসীয় দর্শন-নির্ভর যে সমাজতত্ত্বের চর্চা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে অনেকে সংঘাতমূলক সমাজতান্ত্বিক চর্চা বলে অভিহিত করেন। মার্কসের মূল দর্শন অর্থাৎ "History of all hitherto existing society is the history of class struggle" হ'ল সংঘাতমূলক সমাজতত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু। লেনিনের ভাষায়, "Marxism······combines scientific sobriety in the analysis of the objective state of affairs and the objective course of evolution with the most emphatic recognition of the importance of the revolutionary energy, revolutionary creative genius and revolutionary initiative of the masses-and also, of course, of individuals, groups, organizations and parties, that are able to discover and achieve contact with one or another class".

মার্কসীয় সমাজতত্ত্বকে "বস্তুতান্ত্রিক সমাজতত্ত্ব" আখ্যা দিলে ভুল

হয় না। কারণ মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে সামনে রেখে যদি বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চৈতন্যের কারণ খোঁজা যায় তবেই সমাজতত্ত্ব প্রয়োগভিত্তিক এবং বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকগণ "content" এবং "form" এই দুটি প্রত্যয়কে আলাদা করে সমাজতত্ত্বকে ভাবতে চেষ্টা করেছেন। এই শিবিরের সমাজতাত্ত্বিকগণ (স্পেনসার, "Principles of Sociology", রেডক্লিফ ব্রাউন, "Structure and Function in primitive Society", রবার্ট মার্টন, "Social theory and social Structure", ট্যালকট পারসনস, "The Structure of social Action) সামাজিক উপাদানকে কার্য এবং গঠনমূলক তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যার সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের কোন মিলই নেই। বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজের উপাদানগুলিকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে অ-মার্কসীয় ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে সে সম্পর্কে এল. এন. মস্কিভিচ্‌ভের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "Intensifying process of further socialization of production ; result—state monopoly capital in advanced states in Europe and America has occupied dominant positions. Fusion of the state apparatus with that of large monopolies............ Increasing economic intervention by the bourgeois state." "Elements of planning for economic growth" সম্পর্কে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী এ. স্কেলেসিঙ্গার, এম. হোয়াইট এবং সোরোকিনের মতামত হল : "Yet the rise in the last generation of the mixed society.........to give the state sufficient power to bring about social welfare and economic growth......has revealed classical capitalism and classical socialism as nineteenth

century doctrines……" (স্কেলেসিঙ্গার এবং হোয়াইট) সোরোকিনের মতে : "For the last few decades, especially after 1914, side by side with this "full-blooded" capitalist system, based upon the "full-blooded" private property, there emerged and have grown the "corporation economy" and the "governmentally-managed economy"—both essentially different from the capitalist system". (সোরোকিন লিখিত, "Mutual convergence of the United states and the USSR to the Mixed socio-cultural type".)

বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে মেহনতী মানুষের ঐক্যের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে বলে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীগণ দাবী করেন এবং বলেন, "The working class and the bourgeoisie are now a days equal partners in all social affairs" ডি. বেল বলেন, "The workers have not achieved utopia, but their expectations were less than those of the intellectuals and the gains correspondingly larger".

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকগণ কিভাবে সামাজিক উপাদানের বাস্তবতাকে খর্ব্ব করেছেন এবং মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকগণের কাছে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকের এই ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিমূলক এবং প্ররোচনপ্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়। এডওয়ার্ড শীলস্ তাঁর "The calling of sociology" নিবন্ধে বলেন, 'The politician or citizen must feel trust and confidence in the goodwill of the sociologist who confronts him ; the sociologist must feel the same way about the goodwill of the politician and

citizen". শীলসের বুর্জোয়া প্রসূত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার প্রমাণ হ'ল বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গে সমাজতত্ত্বকে একত্রিত করা এবং সামাজিক বিধি নির্দ্দেশের প্রধান উপকরণ হিসেবে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে ব্যবহার করা। বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা শুধুমাত্র গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করবার নিমিত্তেই রচিত হয়েছে। মার্কসীয় চিন্তাধারাকে তাঁরা "Unscientific theory" এবং "Dogmatism" বলে আখ্যা দিয়েছেন। বেলের কথামত, "They represent a false consciousness or a secular religion".

'Methodological' অথবা 'Gnosiological' চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকগণ নতুন দৃষ্টবাদ নীতিকে সমর্থন করেছেন এবং সমাজতত্ত্বকে "আদর্শ" মুক্ত করে যে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন সেই চিন্তাধারাকে "Propagandist" এবং "Anti-communist" চিন্তাধারা বলা হয় এবং এদের সঙ্গেই মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের বিরোধ।

কার্ল ম্যানহাইম্ যাঁকে একজন চূড়ান্ত পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক বলে ধরে নেওয়া হয় তিনি তাঁর "The Sociology of knowledge" এবং "Ideology and Utopia" গ্রন্থে আদর্শ এবং সমাজের সঙ্গে এক পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন করে বুর্জোয়া চিন্তাধারায় তা' ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, "The sociology of knowledge, as it was developed by Mannheim, was sceptical in regard to the practical effects of consciousness on the historical process". জোসেফ রুসেক্ যিনি বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে একজন তিনিও ম্যানহাইমের চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে সমর্থন করেছেন এবং "আদর্শ"কে এক 'ভ্রম চেতনা' বলে অভিহিত করেছেন। কানাডার সমাজতাত্ত্বিক এল. এইচ. গারষ্টিন বলেছেন, "an

individual who accepts an ideology accepts a philosophy of society in which the past flows inevitably into the present and the present flows equally inevitably into future……" অর্থাৎ গারষ্টিন 'আদর্শ'কে মানব ইতিহাসের নেতিবাচক দর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক জোশেফ স্পেঙ্গলার 'আদর্শ'কে অযৌক্তিক সামাজিক শক্তি (অর্থাৎ মূল্যবোধ বোঝাই) বলে বর্ণনা করেছেন যা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে মোটেই সাহায্য করে না।

কেউ কেউ মনে করেন নাজিতন্ত্র, নতুন নাজিতন্ত্র, স্বাদেশীকতা, দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের অভ্যুত্থান এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলেই সমাজতত্ত্বে 'আদর্শ' এত প্রাধান্য পেয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ এই জাতীয় কোন আদর্শের সূত্রে যুক্ত হতে পারেনি এবং তার ফলে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। বুর্জোয়া সমাজ-তাত্ত্বিকগণ মার্কসীয় সমাজতত্ত্বকে খর্ব্ব করতে নিত্য নতুন প্রত্যয়ের জন্ম দিচ্ছেন এবং সমাজতাত্ত্বিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। ব্রিটীশ সমাজতাত্ত্বিক মরিস জিনস্‌বার্গ এই উদ্দেশ্য সাধন করবার নিমিত্তে 'আদর্শ'কে দুটী ভাগে যথা 'open' এবং 'closed' ideologies-এর উল্লেখ করেন। যাই হোক মূল্যবোধের অস্তিত্বের ভিত্তিতেই দুই শিবির বিভিন্ন সমস্যার ওপর বিভিন্নমুখী আলোচনা করছেন—নতুন নতুন প্রত্যয় জন্মাচ্ছে। যাই হোক্ না কেন আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার জগত আজ যে মূল দুটি ভাগে অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় বিভক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং উভয় শিবিরের কাছে উভয় চিন্তাধারাই বিতর্কিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা

অগাস্ত কোঁত (AUGUSTE COMTE)

(১৭৯৮-১৮৫৭)

সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের অন্তর্গত মন্টিপেলিয়ারে অগাস্ত কোঁতের জন্ম হয়। ১৮১৪ সালে তিনি প্যারিসে "ইকোলী" পলিটেকনিক স্কুলে ভর্ত্তী হন। এই স্কুলটি ছিল উদার রাজনীতি এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার কেন্দ্রস্থল। পরে অবশ্য কোঁত নিজেকে উগ্রপ্রগতিবাদী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে নেন এবং আধারক্ষনশীল-আধাপ্রগতিবাদী বলে নিজেকে প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি মারা যান। জীবনের এই স্বল্পপরিসরে সমাজতত্ত্বকে প্রত্যক্ষবাদের আলোয় তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সমাজ ক্রমবিবর্তনের সেই দৃষ্টবাদ রীতি অমন সুসংহতভাবে কেউই বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১। Opuscules de philosophie sociale (১৮১৯-২৮)

২। Cours de philosophique positive ছয়খণ্ডে প্রকাশিত। (১৮৩০-১৮৪২) মূল গ্রন্থ হ্যারিয়েট মার্টিনিউ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় "The positive philosophy of Auguste comte" নামে অনুদিত (তিনখণ্ডে প্রকাশিত)।

৩। Traite philosphique d' astronomie populaire (১৮৪৪)। মূলগ্রন্থ "A discourse on the positive spirit" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৪। Discours sur lensemble du positivism (১৮৪৮)। মূলগ্রন্থ স্পেলার কর্ত্তৃক "A general view of positivism" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৫। System of positive polity (চারখণ্ডে প্রকাশিত)। ১৮৫১-৫৪ সালে প্রথম ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত।

৬। Appeal to conservatives, ১৮৫৫ সালে প্রথম ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত।

৭। Synthese subjective : on system universal des conceptions proprs a l'etat normal de l'humanite, ১৮৫৬ মূলগ্রন্থ "Religion of humanity : subjective syntheses, or universal system of the conceptions adopted to the normal state of humanity" নামে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত।

প্রত্যক্ষবাদ : প্রাচীন এবং আধুনিক ধারণা

দর্শনকে বাদ দিয়ে সমাজতত্ত্বের আলোচনা হয় কিনা এ নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের তর্ক লেগেই আছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিসংখ্যানের আলোয় সমাজতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে বেশীমাত্রায় উৎসাহী। তবে একথাও ঠিক যে পরিসংখ্যান ভিত্তিক গবেষণারও একটা সুনির্দিষ্ট দর্শন থাকে। ভাবনা হচ্ছে দর্শন, এবং তার গুরুত্ব গবেষণার সিদ্ধান্তে প্রমাণিত কিংবা অপ্রমাণিত হতে পারে। যাই হোক এ বিষয়ে মোটামুটি সকলেই একমত যে দর্শনের গর্ভেই সমাজতত্ত্বের জন্ম। অগাস্ত কোঁত এর মত একজন সমাজতাত্ত্বিকও তাঁর ধ্যানধারণাকে প্রথমে "প্রত্যক্ষবাদ দর্শন" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং পরে সংশোধন করে তিনি 'সমাজতত্ত্ব' কথাটির জন্ম দেন।

অগাস্ত কোঁত ছিলেন দৃষ্টবাদী এক সমাজতাত্ত্বিক। "বৈজ্ঞানিক তথ্যই জ্ঞানের ভিত্তি এবং সত্যে পৌঁছবার একমাত্র নিশ্চিত পথ"—এই ছিল তাঁর ধ্যানধারণা এবং সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মূলমন্ত্র। তিনি মনে করতেন সমাজতত্ত্ব এমনই এক বিজ্ঞান— যেখানে অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা, সিদ্ধান্ত বা যুক্তির কোন স্থান নেই।

প্রাচীন গ্রীক দেশে "অ্যাটমিষ্ট" এবং "সফিষ্ট"দের মধ্যে দৃষ্টবাদী দর্শন প্রথম পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রে ডিমোক্রিটাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ডিমোক্রিটাসই প্রথম ঘোষণা করেন যে প্রকৃতিগত পরিবর্তন হল পরমাণুর অবিরাম সংযোজন এবং বিয়োজনের ফলশ্রুতি। গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে পরমাণুর আকৃতি, গঠন ও ব্যবস্থাবৈশিষ্টের উপর। ভালবাসা ঘৃণা, কিংবা মানবজাতির অপরাপর ভাবপ্রবণতা হল মূলতঃ মুখ্য পদার্থের গতি প্রকৃতির ক্রিয়া প্রক্রিয়া। চিন্তাধারা হল আত্মিক অবয়বের পরিবর্তিত প্রকাশ। জ্ঞানের বিকাশ ঘটে ধারণার মধ্য দিয়ে। ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধ অনুভূতিই হল জ্ঞানের বিকৃতির মুখ্য কারণ। তবে ডিমোক্রিটাসের তত্ত্বের চাইতে গ্রীকদেশের 'সফিষ্ট' আন্দোলনের ধারক ও বাহকেরা প্রত্যক্ষবাদের প্রায় কাছাকাছি আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মূল কারণ ছিল সফিষ্টরা আধিবিদ্যক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে জ্ঞানের সঙ্গে ধারণার এক সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তাঁরা মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত, ভাষার উৎপত্তি ও গঠন প্রকৃতি এবং মানবজাতি, সমাজের গঠন ও চরিত্রের বৈশিষ্টের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে অভিজ্ঞতাকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন অনেক বেশী যা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষবাদের কাছাকাছি একটা সুর বহন করে চলে। তবে আধুনিক দৃষ্টবাদ ফ্রান্সিস বেকনের লেখায় অনেকখানি স্পষ্ট। তাঁর "Novum orgunam" (১৬২০ সালে রচিত) গ্রন্থে তিনি বিজ্ঞানের অশোধিত চিন্তাধারা এবং জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতার (যা মানুষের মনে বাসা বেঁধেছিল) কথা আলোচনা করেছেন। তবে 'Advancement of learning' গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উল্লেখ করেছেন যা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমস্যা সমাধানের গতিপ্রকৃতির বাস্তব রূপরেখা অঙ্কন করতে সাহায্য করে। "New Atlantis" গ্রন্থে বেকন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে মানবজাতির অগ্রগতির কথা

আলোচনা করেছেন এবং তিনি বলতে চেয়েছেন যে মানুষের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব। তাহলে দেখা যাচ্ছে বেকনই প্রথম যিনি বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন অনেক বেশী যা মনুষ্যত্ব পুনরভ্যুত্থানের প্রধান সহায়ক। বেকন ছাড়া আর যাঁরা দৃষ্টবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা হলেন লক্, বার্কলে, ভলতেয়ার, হেলভিটিয়াস, কন্‌ভিলি এবং বেন্‌থাম প্রমুখ দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানী।

কোঁতের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত :

প্রথমেই বলেছি অগাস্ত কোঁতের চিন্তাধারার সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছিল আধারক্ষণশীল আধাপ্রগতিবাদী মতবাদের। তবে তাঁর পাণ্ডিত্য নির্ভর বিচক্ষণতার জন্য তিনি যতখানি শ্রেষ্ঠ তার চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠ উপরোক্ত সমন্বয় সাধনের জন্য যা সেই যুগে যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কোঁত বলতেন, হয় ধারণা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে নয়ত বিশৃঙ্খলতার গর্ভে নিক্ষেপ করবে। আবার ধারণা সম্ভূত মতবাদ নিয়ন্ত্রণ করবে সামাজিক পদ্ধতির গতি প্রকৃতিকে। কোঁত তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনটি তত্ত্বের আওতায় ফেলেছেন।

প্রথম তত্ত্ব :

যে কোন সামাজিক লক্ষ্যবস্তুকে জানা কিংবা ধারণা করা অথবা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় যদি না সেই লক্ষ্যবস্তুকে গোটা সমাজের গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায় এবং যার মধ্যেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রাণীবিদ্যায় যা সম্ভব অর্থাৎ যে কোন প্রাণীর দৈহিক গঠন ও কার্য-ক্রমকে বাদ দিয়ে যে কোন বিশেষ একটি অঙ্গের গঠন এবং প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা, সমাজতত্ত্বে তা সম্ভব নয়। প্রথম তত্ত্বটি হ'ল খণ্ডের উপর অখণ্ডের প্রভাব যা "মানব সমাজের সতস্ফূর্ত বিন্যাসের" পক্ষে অপরিহার্য। কোঁতের এই চিন্তাধারাই ছিল 'স্থিতি সমাজতত্ত্বের' প্রধান উপাদান। আবার সময়ের উপর নির্ভরশীল সমাজবিবর্তনের

ধারা ও অগ্রগতি হল 'গতিময় সমাজতত্ত্বের' বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ কোন এক বিশেষ যুগের সমাজব্যবস্থা বোঝা যায় কিংবা বিশ্লেষণ করা যায় শুধুমাত্র ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে। কোঁতের এই তুলনামূলক ভিত্তি তাই গড়ে উঠেছিল ইতিহাসের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব ঃ

জ্ঞানের অগ্রগতিই হল ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ শক্তি। মানুষ তার জ্ঞানের ব্যপ্তি অনুসারে আচরণ করে। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং অপরাপর মানুষের সঙ্গে তার আচরণ বিধি নির্ভর করে তার সমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপর। দ্বিতীয়তত্ত্বে কোঁত বলতে চেয়েছেন যে জ্ঞানের অবস্থার সঙ্গে সামাজিক অবস্থার এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

তৃতীয় তত্ত্ব ঃ

কোঁতের তৃতীয় তত্ত্ব হল—মানুষ সর্বযুগে এবং সর্বত্র এক এবং অভিন্ন। এর মূল কারণ হল তার দৈহিক গঠনের বিশেষ করে তার মস্তিষ্ক গঠনের অভিন্নতা। সুতরাং এই যুক্তির সত্যতা অনুসারে বলা যায় যে সমাজ একই পথে এবং একই দিকে পরিচালিত হবে এবং মনুষ্যত্বের ধর্মও সমাজ প্রগতির লক্ষ্যপথ ধরে এগোতে থাকবে।

কোঁত প্রবর্তিত তিনটি সূত্র ঃ

উপরোক্ত তিনটি তত্ত্বকে মাথায় রেখে কোঁত তিনটি সূত্রের অবতারণা করেন যার ভিত্তিতে তিনি সমাজের প্রত্যক্ষবাদ ক্রমবিন্যাসের এক পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তিনটি অবস্থার সূত্রকে কেন্দ্রবিন্দু করে মানবজ্ঞানের অগ্রগতি কিভাবে সুসম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোঁত অবস্থাকে তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করেছেন যথা ঃ ক) ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অবস্থা, খ) আধিবিদ্যক সম্বন্ধীয় অবস্থা এবং গ) প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধীয় অবস্থা।

ক) ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অবস্থা ঃ

যে কোন লক্ষ্যবস্তু কিংবা ঘটনাকে যখন অদৃশ্য অলৌকিক অথবা

দৈবশক্তির মানদণ্ডে বিচার করা হয় তখনই ধর্মতত্ত্ব কিংবা আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার উন্মেষ ঘটে। যখন কোন মানুষ তার জীবন এবং ঘটনাকে লক্ষ্য বস্তুর কাছে উৎসর্গ করে তখনই জন্ম নেয় অদৃষ্টবাদের। এই অদৃষ্টবাদই হল ধর্মতত্ত্বের মূল ভিত্তি। যখন মানুষ তার কিছু স্বভাব নির্ভর আচার আচরণ (পাপপুণ্য) কিংবা উদ্দেশ্য অলৌকিক ক্ষমতার মানদণ্ডে বিচার করে তখনই জন্ম নেয় একেশ্বর বা বহু ঈশ্বর বাদ।

খ) আধিবিদ্যক সম্বন্ধীয় অবস্থা ঃ—

যখন কোন ঘটনার প্রকৃতি এবং কারণ আধোভৌতিক বা আধোদৈবিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে বলা হয় আধিবিদ্যকতত্ত্ব। কোঁত এই সূত্রে বলেছেন যে আধিবিদ্যক মাধ্যম হ'ল ধর্মতত্ত্বে নিহিত অলৌকিক শক্তি মাধ্যমকে পরিবর্তিত করবার হাতিয়ার।

গ) প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধীয় অবস্থা ঃ—

দৃষ্টবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষ নিরীক্ষণ এবং যুক্তির সাহায্যে এবং ঘটনার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা কিছু নিয়মের আওতায় ফেলে বিশ্লেষণ করে। কোঁতের মতে, প্রত্যক্ষবাদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ এক অবস্থা কিংবা চিন্তাধারা যা মানবজাতি, বিজ্ঞান এবং মনুষ্যত্বের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য।

সূত্রের প্রমাণ ঃ—

কোঁতের উপরোক্ত তিনটি সূত্রের প্রমাণ দু ভাবে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ মানুষের স্বজ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের ইতিহাসের ক্ষেত্রে। কোঁত এই সূত্রে বলেছেন—"আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের জ্ঞানের বৃদ্ধির কথা স্মরণ করে কি বলতে পারিনা যে আমাদের শৈশব ছিল ধর্মতত্ত্বের ধারণা (রূপকথা)-আশ্রিত যৌবন আধিবিদ্যক ধারণা প্রসূত (কল্পনা) এবং পূর্ণায়ত বয়সে আমরা প্রাকৃত দার্শনিক (দৃষ্টবাদী) ?" এটা ঘটনা যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির

সঙ্গে সঙ্গে জন্মেছে দৃষ্টবাদ ভিত্তিক জ্ঞান। বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলেই কোঁত প্রবর্তিত তিনটি সূত্রের প্রমাণ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের বিবর্তনের দিকে চোখ মেলে ধরলেই আমরা দেখতে পাবো যে প্রতিটি বিষয় পূর্ণতা লাভ করেছে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং আধিবিদ্যক সম্বন্ধীয় অবস্থা থেকে আলাদা হয়ে। দৃষ্টবাদের ভিত্তির উপর সব বিষয় একই সময় একই তালে পূর্ণতা লাভ করেনি। যে সমস্ত বিষয় খুবই সরল অর্থাৎ যা খুবই স্বাভাবিক অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে এবং যা মানুষের কাছে নতুন সেই বিষয়গুলি শুধু প্রত্যক্ষবাদের নীতি এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এই সূত্রে কোঁত তিনটি লক্ষণের উপর বিজ্ঞানের এক স্তরবিন্যাস করেছেন:
ক) যে ঘটনাকে অধ্যায়ন করা হবে তার জটিলতার······খ) যার জন্য সেই ঘটনাবলী মানুষের কাছে অজ্ঞাত এবং গ) সুনির্দিষ্টকাল যখন ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়!

অঙ্কশাস্ত্রই প্রথম ধর্মতত্ত্ব এবং পরে আধিবিদ্যকতত্ত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রত্যক্ষবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তারপর যে বিষয়গুলি দৃষ্টবাদরীতিকে মেনে চলতে শুরু করে সেগুলো হল জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান এবং জীববিদ্যা।

সমাজতত্ত্ব :—এক নতুন বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর এক অচ্ছেদ্য সমন্বয় রয়েছে যা এক সময় মানবজাতির জ্ঞানের সীমানার আওতায় ছিল না (সংখ্যা, গ্রহপুঞ্জ ইত্যাদি)। ক্রমে ক্রমে এই প্রত্যক্ষবাদ মানবজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় রসায়নবিদ্যা এবং জীববিদ্যার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের পূর্ণবিন্যাসকে সফল করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় মানবজাতির দৃষ্টবাদ বিজ্ঞান, সৃষ্ট হয় মানব ইতিহাস এবং মানব সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান যা প্রত্যক্ষবাদের উপর নির্ভরশীল। কোঁত সেই বিজ্ঞানের নাম দেন "সামাজিক পদার্থবিদ্যা" অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব। এই বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি

মানেই সামাজিক অরাজকতা। যদিও মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিল—যদিও মানুষ প্রকৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল কিন্তু তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ধর্মতত্ত্ব এবং আধিবিদ্যক সম্পর্কিত অবস্থার উপর। কিন্তু রূপকথা এবং কল্পনার উপর মানবজাতির অগ্রগতি আর নির্ভর করতে পারলো না—তার অগ্রগতির হাতিয়ার হল সামাজিক নিয়মকানুনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা এবং কর্মযজ্ঞ। সমাজতত্ত্বের মধ্য দিয়েই সেই জ্ঞান জন্ম লাভ করে যা "ধারণার সহায়ক" এবং সেই ধারণা যা কার্য সম্পাদন করতে সাহায্য করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজতত্ত্বের দুটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে ঃ

ক) জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব, দৃষ্টবাদ বিজ্ঞানের বিন্যাসকে পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করে এবং

খ) সামাজিক অগ্রগতি এবং মনুষ্যত্বের ধ্যান ধারণাকে প্রত্যক্ষবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কোঁতের মতানুযায়ী সমাজতত্ত্ব হল জ্ঞান এবং কার্যের এক সম্মিলিত বিষয়। সুতরাং সমাজতত্ত্বের দায়িত্ব হল সমাজের পদ্ধতিগুলো যথাযথ বিন্যাস করা এবং ইতিহাসের তাৎপর্য্য অনুধাবন করে মানবজাতিকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করা কারণ প্রাচীন ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে জ্ঞানের অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ সামাজিক গঠন প্রকৃতি। এই সূত্রে কোঁত বলেছেন, "মানবজাতির এবং জ্ঞানের বিবর্ত্তনের মত সামাজিক বিবর্ত্তনও তিনটি অবস্থার সূত্রকে (ধর্মতত্ত্ব, আধিবিদ্যক, এবং দৃষ্টবাদ) মেনে চলে।" কোঁত তাঁর ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্য তিন ধরণের সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন যার প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের অবস্থা।

সমর নির্ভর সমাজ ঃ—

যখন জ্ঞানের ব্যবহার ধর্মভিত্তিক ছিল তখন সমাজ ছিল

সমর নির্ভর। জ্ঞানের ব্যবহার এবং সমাজের প্রকৃতির মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত সমন্বয় কারণ উভয়ই ছিল প্রভূত্বভিত্তিক এবং একইভাবে স্তরবিন্যাস বিশিষ্ট। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতারা ছিল ধর্মপরায়ন যা তাদের ধর্ম-যাজকদের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছিল। অবশ্য যেখানে ধর্মভিত্তিক ক্ষমতা এবং নাগরিক ক্ষমতা উভয়েই পাশাপাশি বিরাজ করতো সেখানে সৃষ্টি হ'ত সংঘর্ষ।

এই সমর নির্ভর সমাজ যা প্রধানতঃ অবৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল সেখানে কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান উপজীবিকা। পরিবার ছিল সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং একমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই পরিবার থেকেই উদ্ভূত হতো রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষমতা। মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত জীবন যাপনে প্রয়াসী হবার পেছনে ছিল সুসংহত সামাজিক ধারাকে অব্যাহত রাখার ঐকান্তিক ইচ্ছা যাযাবর জীবন যাপন থেকে নতুন এক উন্নততর স্থায়ী সভ্যতার প্রবর্ত্তন করার বাসনা এবং মানবজাতি এবং মানবসভ্যতার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সর্বপরি সমাজ জীবনকে সুদৃঢ় এবং সুগঠিত করবার শপথ। সমর নির্ভর সমাজ উপরোক্ত চাহিদাগুলোর জন্ম দিয়েছিলো এবং এক ক্ষীণ সভ্যতার সূচনা করল।

আইন নির্ভর সমাজ ঃ—

আইন নির্ভর সমাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আধিবিত্তক চিন্তাধারা। এই সমাজে প্রথম আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং পার্থিব ক্ষমতার মধ্যে এক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং পার্থিব ক্ষমতা অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা যখন প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়ে তখনই পার্থিব ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। রাষ্ট্র এবং স্বদেশ সম্বন্ধীয় ভাবধারা মানুষকে করে অনুপ্রাণিত এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অনৈক্যই এই ভাবধারাকে সুদৃঢ় করে তোলে। একদল, যারা রাষ্ট্রের

ক্ষমতা এবং সংজ্ঞা নিয়ে ভাবতে শুরু করল তাঁরা হলেন মন্ত্রী যাদের কাছে তদানীন্তন শাসনকর্তা কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করবে—আর একদল কূটনীতিজ্ঞ যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে। সমর নির্ভর সমাজে সামরিক সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে যা ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা বিভাজন হল মন্ত্রী এবং কূটনীতিজ্ঞের মধ্যে। এই ধরণের সমাজ নিঃসন্দেহে "সংকটপূর্ণ" যুগের সূচনা করে। জ্ঞানের রাজত্বে আধিবিদ্যক চিন্তাধারাও এক সংকটপূর্ণ মুহুর্ত্ত কারণ এই চিন্তাধারা ধর্মতত্ত্বকে পরিহার করে দৃষ্টবাদের ইঙ্গিত বহন করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষবাদ কখনই এই সংকটপূর্ণ ধাপকে অস্বীকার করে প্রবর্তিত হতে পারে না। সমাজ বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি বিশেষ প্রাধান্য যোগ্য। আইন নির্ভর সমাজ আধ্যাত্মিক প্রভূদের একচেটিয়া শাসনকে উপেক্ষা করেছিল তাই আইন নির্ভর সমাজ ছিল সংঘাতবহুল এবং দ্বন্দমুখর। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় ১৪০০ শতাব্দীতেই সংকটপূর্ণ যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং পাঁচ শতাব্দী ধরে অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লব এবং সংসদীয় অভ্যুত্থানের কাল পর্যন্ত সেই মুহুর্ত্ত স্থায়ীত্ব লাভ করে।

শ্রমশিল্প নির্ভর সমাজ ঃ—

আইন নির্ভর সমাজ বিবর্ত্তনের পথ ধরে একদিন "শ্রমশিল্প নির্ভর সমাজে" পদার্পণ করল। এই সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রত্যক্ষবাদের ধ্যান ধারণা। শিল্প সভ্যতার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টবাদ বিজ্ঞান তার সহজ পথ ধরে চলতে শুরু করল। কোঁতের মতে শিল্প সভ্যতা, বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণায় মানবজাতির যুক্তিপূর্ণ কর্ম-পদ্ধতিকে বহির্জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সহায়তা করেছিল। এক কথায় বলা যায় শিল্প সভ্যতা হল দৃষ্টবাদ মানব সভ্যতার কেন্দ্র বিন্দু। কোঁতের মতে, শিল্প নির্ভর সমাজে কতগুলো বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় ঃ

ক) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা শিল্প নির্ভর সমাজের প্রধান হাতিয়ার।

খ) শিল্প হল বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার প্রথম সুদৃঢ় এক সামাজিক অভিব্যক্তি এবং শিল্প সমাজের তো বটেই। সমর নির্ভর সমাজের ভিত্তি যেমন পরিবার, আইন নির্ভর সমাজের ভিত্তি যেমন স্বদেশ তেমনি শিল্প নির্ভর সমাজের ভিত্তি হল শিল্প এবং তার উৎপাদন।

গ) শিল্পোৎপাদন তখনই বৃদ্ধি পায় যখন কলকারখানার সন্নিকটে এবং শহরে কর্মীসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সর্বহারা বলে যারা পরিচিত সেই সব মজুরেরা শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ ক'রে নিজেদেরকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

ঘ) সামাজিক অসাম্য যে কোন সমাজের গঠন প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পত্তি এবং ক্ষমতা থাকবেই। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানা কোনদিনই সমাজ থেকে অপসারিত হবেনা, এবং শিল্প অর্থনীতিতে পরিচালন শক্তি হিসাবে কাজ করবে। একথা পূর্ব নির্ধারিত যে সামন্ততন্ত্র এবং রাজতন্ত্র যা সমর তত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত—একদিন বিলুপ্ত হবেই। আইন নির্ভর সমাজ এবং সংসদীয় রাজনীতিও বিলুপ্তির পথে। দুই গোষ্ঠীর হাতে হবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং তারা হ'ল শিল্পপতি এবং প্রযুক্তিবিদ্ যারা কলকারখানায় উৎপাদন-গঠন এবং বিন্যাস পরিচালনা করবে। আর একদলও অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিকেরা সমাজ গঠনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবে। ঙ) এই শিল্প নির্ভর সমাজকে অবশ্য সংঘাত এবং সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অবশ্য তা দীর্ঘস্থায়ী কোনদিন হবে না। কারণ আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং শান্তি শিল্পসভ্যতার অগ্রগতির সাথে পা ফেলে বিস্তার লাভ করবে যা নির্ভর করবে বৈজ্ঞানিক কিংবা দৃষ্টবাদ

ধ্যান-ধারণার পরিব্যাপ্তির উপর এবং দ্বিতীয়তঃ, নির্ভর করবে সমাজবিজ্ঞানীর কর্মযজ্ঞের উপর যার উপর গুরুদায়িত্ব রয়েছে সমাজেরই ইতিহাস এবং তার গঠন প্রকৃতিকে বিন্যস্ত করে তোলার। চ) প্রারম্ভেই যদি শিল্পনির্ভর সমাজ সামাজিক অনৈক্য এবং সংকটের মুখোমুখি হয় তবে তার মূল কারণ বিশেষত্বের আধিক্য যার থেকে উদ্ভূত হয় বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংঘাত, (মালিক বনাম কর্মচারী, উৎপাদক বনাম ক্রেতা)। বিশেষত্বর আধিক্য অবশ্য প্রযুক্তিবিদ্যা এবং শ্রম ও সমাজের গঠন প্রকৃতির উন্নয়নের সাথে সাথে স্তিমিত হয়ে আসবে। দৃষ্টবাদ ধ্যান-ধারণার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মানবজাতি, সমাজজীবন ও ইতিহাসের চাহিদা বুঝতে পারবে এবং তা গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষিত হবে। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিকের দায়িত্ব হল ঈশ্বরীয় এবং আধিবিদ্যক ধারণাকে বাদ দিয়ে সমগ্র সমাজের প্রগতি, মানবজাতির নাগরিক বোঝাপড়া এবং সমষ্টিগত জীবনকথা চিন্তা করে, নৈতিক আইন প্রবর্ত্তন করা। এই নৈতিক আইন প্রবর্ত্তনের ফলে শিল্পনির্ভর সমাজ সংঘাত এবং সংঘর্ষের হাত থেকে মুক্তি পাবে। অবশ্য জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে কোঁত বলেছিলেন যে এই নৈতিক আইনকে ধর্মের অনুশাসন থেকে একেবারে মুক্ত করা সম্ভব নয় এবং তিনি এক নতুন ধর্মের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকবে না কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী বহন করবে এবং যার মূলমন্ত্র হবে মনুষ্যত্বের ধর্মপ্রচার করা। ছ) পরিশেষে, শিল্পনির্ভর সমাজ বিবর্ত্তনের পথ অতিক্রম করে পৌঁছবে এমন এক অবস্থায় যেখানে বড় বড় দেশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র দেশের জনসংখ্যা হবে কয়েক লক্ষের কাছাকাছি এবং শিল্পোৎপাদনই হবে এর মূল ভিত্তি।

মনুষ্যত্বের ধর্ম :—

নতুন সমাজের ধর্মে মনুষ্যত্বই হল উপাসনার বিষয়বস্তু। মনুষ্যত্ব হলো অতীত, এবং বর্তমানের এক ইঙ্গিতবাহী যা মানুষের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। নতুন ধর্মের কথা প্রসঙ্গে কোঁত বললেন যে পৃথিবীর মহাশূন্য হল বুদ্ধির মূল মাধ্যম এবং পৃথিবী হল ভাগ্যবিধাতা। এই মাধ্যম, এই ভাগ্যবিধাতা এবং এই সকল বস্তু অর্থাৎ মহাশূন্য, পৃথিবী এবং মানবজাতি হলো দৃষ্টবাদত্রিত্ব। সুতরাং সমাজতত্ত্বে অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের স্থান অনেক বেশী। পুরুষেরা যুক্তিপূর্ণকাজের দায়িত্ব বহন করবে এবং স্ত্রীলোকেরা হবে সহানুভূতিশীল এবং স্পর্শকাতর। উনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেবে শিল্পনির্ভর সমাজ—এই ছিল কোঁতের বিশ্বাস। কিন্তু সেণ্ট সাইমন, মার্কস, এবং এঙ্গেলস এর চিন্তাধারা ছিল কোঁতের ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোঁত বিশ্বাস করতেন না যে ব্যাক্তিগত মালিকানালোপ বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত। কোঁত কখনই অর্থনীতিবিদগণের আশাবাদী ধ্যান ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে কোঁত ছিলেন মানবজাতির গঠন প্রকৃতির ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। অর্থাৎ তিনি শ্রমনির্ভর সমাজের আমলাতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন—তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন কলকারখানায় এবং রাজনীতিতে প্রযুক্তিবিদগণের বিশেষ ভূমিকার কথা এবং সর্ব্বোপরি তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সমাজ তার পরিকল্পনাবিদ্ এবং সংগঠনের যুক্তি এবং কর্মের উপর আশ্রয় করে গড়ে উঠবে। কোঁত প্রবর্ত্তিত শিল্পনির্ভর সমাজ সেই পরিকল্পনারই নামান্তর মাত্র।

—::—

কার্ল মার্কস : (Karl Marx)

(১৮১৮—১৮৮৩)

১৮১৮ সালের ৫ই মে প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ত্রিয়ার শহরে কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন এক প্রখ্যাত আইন-জীবী। মার্কসের পরিবার ছিল সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান। ত্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন্ এবং পরে বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন, ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। ১৮৪১ সালে তিনি "এপিকিউরাসের দর্শন" সম্পর্কে থিসিস পেশ করেন। তদানীন্তন সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে মার্কস অধ্যাপনার আশা ত্যাগ করেন এবং "রাইনিশ গেজেট" নামে সরকার বিরোধী একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৮৪৩ সালে মার্কস জেনি ফন ভেস্তভালেনকে বিবাহ করেন। ১৮৪৪ সালে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্যারিসে আসেন এবং মার্কসের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। উভয়েই "পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লবী প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজমের (মার্কস্‌বাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন।" তারপর থেকেই মার্কসের জীবন দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটতে থাকে। অবশেষে রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এবং অসীম ক্লেশ সহ্য করে ১৮৮৩ সালের ১৩ই মার্চ মার্কস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী :-

১। Economic and Philosophic Manuscripts, ১৮৪৪ সালে রচিত।

২। On the Jewish Question, Early Writings ১৮৪৪ সালে রচিত।

৩। The Holy Family, ১৮৪৫ সালে রচিত।

৪। Theses on Feuerback" Ludwig Feuerback and the outcome of classical German Philosophy ১৮৪৫ সালে রচিত।

৫। The Poverty of Philosophy, ১৮৪৭ সালে রচিত।

৬। The German Ideology, এঙ্গেলসের সহিত ১৮৪৬-৪৭ সালে রচিত।

৭। The Communist Manifesto, এঙ্গেলসের সহিত ১৮৪৮ সালে রচিত।

৮। Wage Labour and Capital, এঙ্গেলসের সহিত ১৮৪৯ সালে রচিত।

৯। The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, ১৮৫২ সালে রচিত।

১০। The First Indian War of Independence, এঙ্গেলসের সহিত ১৮৫৭-৪৯ সালে রচিত।

১১। A Contribution to the critique of Political Economy, ১৮৫৯ সালে রচিত।

১২। Herr Vogt, ১৮৬০ সালে রচিত।

১৩। Theories of Surplus value : Selection, ১৮৬১-৬৩ সালে রচিত।

১৪। The Civil war in the United States, এঙ্গেলসের সহিত ১৮৬১-৬৬ সালে রচিত।

১৫। Capital, ৩ খণ্ড ১৮৬৭, ১৮৬৭-৭৯ সালে রচিত।

১৬। The Civil war in France, ১৮৭১ সালে রচিত।

১৭। Critique of the Gotha Programme, এঙ্গেলসের সহিত ১৮৫৭ সালে রচিত।

১৮। The Class Struggles in France, ১৮৪৮-৫০ সালে রচিত।

মার্কসের অবদান ঃ—

সমাজতত্ত্ব বিষয়টি মার্কসকে বাদ দিয়ে ভাবা একেবারেই সম্ভব নয়। মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ যে ভাবে সমাজকে যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করেছে তার "অপূর্ব সঙ্গতি ও অখণ্ডতা" সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। যদিও অপরাপর সমাজতাত্ত্বিকগণ মার্কসের মতবাদের সঙ্গে একমত নন অর্থাৎ তাঁরা স্বীকার করেন না যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কাঠামোই সমাজের নিয়ন্ত্রণ শক্তি হিসাবে কাজ করে। ম্যাক্স হ্বেবারের মতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকারণই সমাজের ইঙ্গিতবহ। যাই হোক লেনিনের কথায় মার্কসের প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতায় তাঁর রচনাগুলিতে "রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সমাজজীবনের ক্ষেত্রের উপরও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ-বিকাশের সব থেকে সর্বাঙ্গীন ও সুগভীর মতবাদ—দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব, শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিষ্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।" মার্কসের সমাজ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা লেনিনের মতানুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১। দার্শনিক বস্তুবাদ ২। দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব। ৩। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং ৪। শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব।

দার্শনিক বস্তুবাদ ঃ—

কার্ল মার্কস তার বস্তুবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন দার্শনিক হেগেলের চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করে। হেগেল বিশ্বাস করতেন মনন প্রক্রিয়া হল বাস্তবতার স্রষ্টা (ডিমিয়ারগস) এবং এই প্রক্রিয়াকেই তিনি আইডিয়া কিংবা ভাব আখ্যা দিয়ে একটি স্বাধীন সত্তায় পর্য্যন্ত পরিণত করেছিলেন। হেগেল ছিলেন ভাববাদী অর্থাৎ "তাঁর কাছে মানসিক ভাবনা; বাস্তব বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত প্রতিবিম্ব নয়—পক্ষান্তরে তাঁর মতে বিশ্বজগৎ আবির্ভাবের *পূর্ব থেকেই কোথায় যেন বর্তমান কোন এক আইডিয়ার প্রতিচ্ছবিই*

হল বস্তু ও তার বিকাশ।” এদিকে “আত্মার আগে প্রকৃতি না প্রকৃতির আগে আত্মা……”এই প্রশ্নের উত্তর অনুসারে দার্শনিকেরা দুটি মতবাদের আওতায় বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা প্রকৃতির আগে আত্মার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন এবং সেই কারণে শেষ পর্য্যন্ত কোনো না কোনো ভাবে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকল্প মেনেছেন……তাঁরা হলেন ভাববাদী। অপরপক্ষে যাঁরা প্রকৃতিকেই আদি প্রেরণা বলে ধরেছেন তাঁরা হলেন বস্তুবাদী। মার্কস এবং এঙ্গেলস ছিলেন বস্তুবাদের প্রবক্তা। “বিশ্বজগতের ঐক্যতার সত্তায় নয় তার বস্তুময়তায়……দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও দুরূহ অগ্রগতির মধ্য থেকে তার প্রমাণ মিলবে……গতিই হল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ”।

দ্বান্দিক তত্ত্ব :—

হেগেল প্রবর্ত্তিত দ্বান্দিক তত্ত্বকে মার্কস মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করতেন এবং হেগেলকে প্রবক্তা হিসাবে স্বীকার করতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত হন নি। “দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের কাছে চিরকালের জন্য স্থির নির্দিষ্ট, পরম পবিত্র বলে কিছুই নেই। সবকিছুর উপরেই, সবকিছুর ভেতরেই অনিবার্য্য পতনের সিলমোহর তা দেখে এবং উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া, নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অন্তহীন উর্দ্ধতন ছাড়া কিছুই এর কাছে টেকে না। দ্বন্দ্বমূলক দর্শন ব্যাপারটাই হল চিন্তাশীল মনের উপর এই প্রক্রিয়ারই প্রতিচ্ছাব মাত্র।” মার্কস, হেগেলের এই চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে দর্শনের বিপ্লবী অংশটুকুকে প্রকাশ করে তোলেন। বিবর্তনের ধারণাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন সর্পিল বৃত্ত বিকাশ হিসাবে। শুধু তাই নয়, “উল্লম্ফন, বিপর্য্যয়, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিকাশ;” পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণ ইত্যাদি তার বিকাশের তত্ত্ব।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা :—

মার্কস বলেছিলেন, “সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে……বস্তুবাদী

ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির ওপর এই বিজ্ঞানের পুণর্গঠন করা আবশ্যক।" মার্কসের মতানুসারে, "সামাজিক সত্তা দিয়ে, সামাজিক চেতনার ব্যাখ্যা দাবি করবে বস্তুবাদ"। মার্কস বলেছেন, "যন্ত্রবিদ্যা উদ্ঘাটিত করেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক, তার জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি এবং তা থেকে উদ্ভুত মানসিক ধ্যান-ধারণা।" মার্কস তাঁর "অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে" লিখেছেন, "নিজেদের জীবনের সামাজিক উৎপাদন মানুষ এমন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অপত্রিহার্য্য সম্পর্কের মধ্যে—উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে—প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ যা বৈষয়িক উৎপাদন শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটির পক্ষেই উপযোগি"।

উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টি

|

অর্থনৈতিক কাঠামো

আইন বিষয়ক উপরি কাঠামো   রাজনৈতিক উপরি কাঠামো

সামাজিক চৈতন্য।

শ্রেণী সংগ্রাম ঃ-

মার্কস কমিউনিষ্ট ইসতেহারে লিখেছেন, "আগেকার সকল সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস,"......"একদিকে নিপীড়ক এবং অন্যদিকে নিপীড়ীতের মধ্যে বিরোধ লেগে থেকেছে চিরকাল, কখনো প্রকাশ্যে কখনো আড়ালে সংগ্রাম চলেছে অবিরাম ......সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম হল তার মধ্যে শ্রেণী-বৈরিতার অবসান হয় নি।" মার্কসের

মতে সমাজে দুটি বৃহৎ শ্রেণী যথা বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত পরস্পরের সম্মুখীন, "যে সব শ্রেণী আজ বুর্জোয়াদের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সত্যকার বিপ্লব-শ্রেণী হল একমাত্র প্রলেতারিয়েত" এবং মার্কসের মতে, "প্রত্যেকটা শ্রেণী সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।"

মার্কসের পরিচয় শুধুমাত্র সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেই নয়। তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদও পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর "মূল্য সম্পর্কিত তত্ত্ব," উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কিত আলোচনা এবং পুজিবাদী সঞ্চয়ের প্রবনতা" সম্পর্কিত তত্ত্ব যার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়—মার্কসীয় দর্শনের এক সুগভীর, প্রাঞ্জল এবং সুসংহত চিন্তাধারারই পরিচয় বহন করে।

সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যেখানে তিনি অর্থনৈতিক মুক্তিকেই সমাজ উন্নয়নের চাবিকাঠী বলে চিহ্নিত করেছেন। মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী যন্ত্রবিদ্যার প্রসার অথবা সমাজের বস্তুতান্ত্রিক পদক্ষেপই রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সমাজের অপরাপর পরিবর্তনকে সূচিত করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক শক্তি এবং সমাজের বস্তুতান্ত্রিক ঘটনাবলী কিছু ধনীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মার্কসের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজই উন্নয়নের শেষ ধাপ নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিনত হয়েছিল তেমন ধনতান্ত্রিক সমাজও একদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিনত হবে—এই ছিল মার্কসের ধারণা। বিপ্লব এবং শ্রেণীসংগ্রামই হল এই পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার। মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় যে সমাজ পরিবর্তনের ধারা ধনতান্ত্রিক সমাজেই অবরুদ্ধ হবে না। উপরোক্ত তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে মার্কসের ধারণায় সমাজ হল সাম্যবাদের এক দর্শন যার আর এক নাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এখানেই মার্কসের সঙ্গে অপরাপর পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকের চিন্তাধারার প্রভেদ। পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন সমাজতত্ত্ব হ'ল একটি বিজ্ঞান যেখানে

পরিকল্পনার কোন সুযোগ নেই বা থাকতে পারে না। কিন্তু মার্কসের মতে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিকল্পনার এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে।

ড্যুরখ্যাইম্ এবং ম্যাক্স হ্বেবার সমাজ ও ধর্মের মধ্যে এক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে যে ধরণের গবেষণা করেছেন মার্কসের মতে তা নিঃসন্দেহে পণ্ডিত্য নির্ভর হলেও সমাজতাত্ত্বিক মুল্যবোধ সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় ধর্ম হল আফিংয়ের নেশা, ধনতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম হল এক আচ্ছাদন যার মাধ্যমে ধনিক শ্রেণীর নির্লজ্জ শোষণ আড়াল করা যায়। তাঁর কথায় "It (Releigion) is the heart of the heartless world. It is the spirit of the spiritless situation. It is the sigh of the oppressed-creature."

শ্রম বিভাজন এবং বিচ্ছিন্নতা ঃ

মার্কস সামাজিক শ্রম বিভাজন এবং উৎপাদন সম্পর্কিত শ্রম বিভাজনকে আলাদা করে নিয়ে বলেছেন,

"If we keep labour alone in view, we may designate the separation of social production into its main division or genera viz. agriculture, industries etc—as division of labour in general, and the splitting up of these families into species and sub-species, as division of labour in particular, and the division of labour within the workshop as division of labour in singular or in detail".

সামাজিক উৎপন্নের এই যে বিভাজন তা ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি করে এবং সমাজকে "আছে" এবং "নেই", "শোষিত" এবং 'শোষকশ্রেণী' ও 'অত্যাচারিত' এবং "অত্যাচারী" শ্রেণীতে বিভক্ত করে। মার্কসের ভাষায়, "Division of labour in a society,

and the corresponding tying down of individuals to a particular calling, develops itself, just as does the division of labour in manufacturer, from opposite starting points........".

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষমতা এবং বাণিজ্য হ'ল শ্রম বিভাজনের প্রাক্ অবস্থা।

"The greatest division of material and mental labour is the separation of town and country. The antagonism between town and country begins with the transition from barbarism to civilization, from tribe to state, from locality to nation, and runs through the whole history of civilization to the present day........".

উৎপাদন প্রথার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরের সঙ্গে তার উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে।

"In the first place, in the form of machinery, the implements of labour become automatic, things moving and working independent of the workman. They are thenceforth an industrial 'perpetuum mobile' that would go on producing forever ....Alongwith the tool, the skill of the workman in handing it passes over to the machine. The capabilities of the tool are emancipated from the restraints that are inseparable from human labour power. Thereby the technical foundation on which is based the division of labour in manufacture, is swept away. ....In handicrafts and manufacture,

the workman makes use of a tool, in the factory, the machine makes use of him. ......In manufacture the workmen are parts of a living mechanism. In the factory we have a lifeless mechanism independent of the workman, who becomes its mere living appendage........

শ্রম বিভাজন তার সমস্ত অবস্থার মধ্যে ব্যক্তির কাছে এক বিচ্ছিন্ন শক্তি বলে পরিগণিত হয়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে মার্কস্ লেখেন ঃ

"........A direct consequence of the alienation of man from the product of his labour, from his life activity and from his species life, is that man is alienated from other men, when man confronts himself he also confronts other men....Thus in the relationship of alienated labour every man regards other men according to the standards and relationships in which he finds himself placed as a worker."

মার্কসের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হ'ল অর্থনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার প্রবর্তন। বটোমর বলেন, "Marx, in treating the political economy of his time as an 'ideology', was attempting to analyse the social relationships which, in his view, underlay the economic relationships expressed in values, prices etc."

স্কামপিটারের ভাষায়,···though Marx defines capitalism sociologically, i, e, by the institution of private control over means of production, the mechanics of capitalist society are provided by his economic

theory. This economic theory is to show how the sociological data embodied in such conceptions as class, class interest, class behaviour, exchange between classes, work out through the medium of economic values, profits, wages, investment etc....".

মার্কস যদিও কোঁতের মত সমাজতত্ত্ব শব্দটি চয়নও করেন নি কিংবা তাঁর লেখার কোথায় ব্যবহারও করেন নি তবুও তিনি কোঁতের তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। "He condemned especially, its theological and sectarian spirit and its prophetic frenzy, but without feeling the need to subject the theory as a whole to systematic criticism. Probably Marx judged Comte mainly from the activities of his disciples, and especially his French disciples, who wanted to make positivism the philosophy of the labour movement." কোঁতের দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কসের দৃষ্টবাদনীতির ওপর যেমন এক বিদ্বেষ জন্মেছিল তেমনি এক নতুন ধরনের বিজ্ঞানের ধারণাও জন্মেছিল যা প্রায় সমাজতত্ত্বের কাছাকাছি এক আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল বলা যায়। মার্কসের তত্ত্ব যা সাধারণতঃ রাষ্ট্রনীতি নির্ভর অর্থনৈতিক মতবাদের সুর বহন করে, সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে সেই মতবাদকে সমাজের এক বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা বললে ভুল হয় না। বটোমোরের ভাষায়, মার্কস বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন:

1) "The Abstract characteristics common to all forms of society, taking into account their historical aspect.
2) The main constituent elements of the internal structure of bourgeois society, upon which the

basic social classes rest, capital, wage labour, and landed property. Town and Country. The three great social classes. The exchange between them. Circulation. Credit.

3) Crystallization of bourgeois society in the form of the state. The 'unproductive' classes. Taxation, Public debt, Public credit, Population, Colonies, Emigration.

4) International relations of production……

5) The world market and crises.

মার্কস এরিসটটলের "মানুষ" সম্পর্কিত আলোচনাকে আরও সুবিন্যস্ত করে লিখলেন, "Man is in the most literal sense a 'Zoon Politikon', not merely a social animal, but an animal which can develop into an individual only in society". সমাজ সম্পর্কে আলোচনাকালে মার্কস কখনোই সমাজকে এক একক হিসাবে ব্যাখ্যা দেননি। তাঁর মতে সমাজ হ'ল, "…individuals in their interrelations or interaction". এই সম্পর্ক দেখা যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে। "The result at which we arrive, is not that production, distribution, exchange and consumption are identical, but that they are all elements of a totality, distinctions within a unity. Production predominates ……but there is interaction between the various elements. This is the case in every organic whole."

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী মতবাদকে ইতিহাস নির্ভর সমাজতত্ত্ব বললে ভুল হবে না। ১৮৫৯ সালে "Preface"-এ সমাজতত্ত্বের কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা মার্কস তুলে ধরেছিলেন যার ফসল

হ'ল (১) সমাজের অর্থনৈতিক গড়ন, (২) আদর্শগত উপরিকাঠামো, (৩) সামাজিক বিপ্লব এবং (৪) সমাজের ভবিষ্যৎ। এককথায় বলা যায়, আধুনিক যুগের সমাজতত্ত্ব মার্কসের কাছে কতখানি যে ঋণী তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মার্কস ছিলেন এমন এক সমাজতাত্ত্বিক যাঁর গুণ ছিল সরলতা, চরিত্র ছিল লক্ষ্যপথ নির্দিষ্ট রাখা, সুখ ছিল সংগ্রামে, দুঃখ ছিল অধীনতা স্বীকার করায়, ঘৃণা ছিল দাসত্বে, পেশা ছিল 'বই পড়া' এবং যে রঙের পূজারী ছিলেন তা ছিল লাল।

—o—
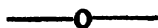
হারবার্ট স্পেনসার ঃ—(Herbert Spencer)
(১৮২০-১৯০৩)

প্রস্তাবনা ঃ

আধুনিক সমাজতত্ত্বের মূল শিকড় নিহিত ছিল ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব ও আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গত বসেটের "Discours sur l'histoire Universelle" (১৮৬১ সালে প্রকাশিত) বইটির উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য আর, জি, টারগট্, বসেটের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে গবেষণামূলক নিবন্ধের উপস্থাপনা করেন তাতে বলা হয়েছে মানবসমাজ কয়েকটি পর্ব বা অবস্থার মধ্য দিয়ে বিবর্ত্তিত হয়েছে। যেমন শিকার নির্ভর উপজীবিকা থেকে পশুপালন ভিত্তিক অর্থনীতি এবং অবশেষে কৃষিভিত্তিক সমাজ। ডেভিড হিউমের "Of the Rise and Progr›ss of the Arts and Science (১৭৪২ সালে প্রকাশিত) বইটিও সমাজ বিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। উপরোক্ত চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে সেণ্ট সাইমন এবং অগাস্ত কোঁতের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয় এবং তাঁরা সমাজ বিবর্ত্তনের আলোয় সামাজিক পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানের জন্ম দেন। অবশ্য সমাজ বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে ডারউইন এবং ওয়ালেসের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত তিনি হলেন হারবার্ট স্পেনসার।

সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী ঃ—

হারবার্ট স্পেনসারের জন্ম হয় ইংলণ্ডে ১৮২০ সালে। তাঁর শিক্ষাজীবন বিশেষ কোন শিক্ষাকেন্দ্রের গণ্ডীর মধ্যে কাটেনি অর্থাৎ তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি পরিব্যপ্ত করেছিলেন শিক্ষাকেন্দ্রের আওতার বাইরে থেকে। ১৯০৩ সালে তিনি মারা যান। তাঁর এই

অদ্ভুত জ্ঞানের রাজত্বে বসে তিনি গবেষণার পরিধি কত সুদূর প্রসারী এবং ব্যপ্ত করে তুলেছিলেন তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল

১) Social statistics, ১৮৫০ সালে প্রকাশিত।
২) Progress: Its Law and cause, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত।
৩) The principles of psychology, ২ খণ্ডে প্রকাশিত, (১৮৫৫ সালে)
৪) First principle of a New System of Philosophy, ১৮৬২ সালে প্রকাশিত,
৫) The principles of Biology (২ খণ্ডে সমাপ্ত), ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত।
৬) The principles of Sociology (২ খণ্ডে প্রকাশিত) ১৮৭৬-৮৬
৭) The principles of Ethics (২ খণ্ডে প্রকাশিত) (১৮৭৯, ১৮৯২)
৮) The study of Sociology, ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত।
৯) The man versus the state, ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত।

স্পেনসারের চিন্তাধারা অনুসৃত হয়েছিল মূলতঃ সমাজ বিবর্ত্তনকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ একদিকে তিনি যেমন ছিলেন বিবর্ত্তনবাদী এবং অন্তদিকে সমাজতাত্ত্বিকও বটে। তিনি মনে করতেন সমাজতত্ত্ব হল সমাজ বিবর্ত্তনের জটিলতম বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিস্ফূট করার এক বিজ্ঞান। শুধু তাই নয় সমাজতত্ত্ব বিষয়টির মূল লক্ষ্যবস্তু হল মানব-জাতির ব্যবহার সম্পর্কিত পরিচয় জ্ঞাপন করা এবং বিবর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ কাল বা মুহূর্তের বিশেষ বিশেষ ধ্যান ধারণার উন্মেষের কথা আলোচনা করা। অর্থাৎ স্পেনসার চেয়েছিলেন সামাজিক

কাঠামোর সঙ্গে সেই সময়কার মানবজাতির মূল্যবোধ এবং ধারণার সমন্বয় ঘটানো।

স্পেনসারের মতে সামাজিক পরিবর্তন হল একটি সামাজিক পদ্ধতি যা জীবজগতের শারীরিক বিবর্ত্তনের মত একই নিয়ম মেনে চলে।

স্পেনসারের তত্ত্ব ঃ—

স্পেনসারের বিবর্ত্তনবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথমতঃ তিনি জৈবিক অবস্থার সঙ্গে সামাজিক অবস্থার এক সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ জৈবিক ঘটনার জন্য যে যে কার্যকারণ দায়ী সামাজিক ঘটনার জন্যও সেই সেই কার্যকারণ একইভাবে কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলতে চেয়েছেন যে দৈহিক এবং সামাজিক জীবন ও অবস্থা হ'ল বৃদ্ধি ও প্রগতির একই মাপকাঠি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় বিবর্ত্তনের প্রথম পর্য্যায়ে পৃথিবীর সকল পর্য্যায়ের প্রাণী ছিল এককোষী এবং দৈহিক গঠনও ছিল সরল। ঠিক তেমনি সভ্যতার আদিতে মানবজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত থেকে সরল জীবন যাপন করত। বিবর্ত্তনের পথ ধরে যখন প্রাণীকূলের জৈবিক এবং দৈহিক আকৃতি ও কার্যক্রমের জটিলতা বাড়লো মানবজীবনেও নেমে এলো জটিলতা এবং বিভেদ। এককোষী প্রাণী থেকে আজকের মানবজাতির এই যে বিবর্ত্তন—সমাজের ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য অর্থাৎ সরল সামাজিক অবস্থা থেকে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজ। স্পেনসার প্রদত্ত একটি দৃষ্টান্ত এই সূত্রে তুলে ধরছি ঃ "নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে গোটা শরীরটাই পাকস্থলী, শ্বাসতন্ত্র এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।······আদি সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজের সকলেই যোদ্ধা, সকলেই শিকারী, সকলেই বাস্তুকার······ অর্থাৎ সকলেই নিজের চাহিদা মেটাতে সব কাজই করে থাকে,······'। আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি যেখানে তিনি জৈবিক এবং সামাজিক অবস্থার মধ্যে আকৃতিগত সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন।

"নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে যকৃৎ উৎসেচক (যকৃৎ থেকে নিঃসৃত হয় না) অন্ত্রপর্দার মধ্যস্থিত কোষ থেকে নির্গত হয়। এই কোষগুলি রক্ত থেকে কিছু পদার্থ আলাদা করে রাখবার কাজ করে……এই পদ্ধতি অনেকাংশে শিল্পনির্ভর সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কোন শ্রমিক তার স্বকার্যে নিজেই লিপ্ত থাকে এবং নিজেই তার উৎপাদন ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। আমাদের গ্রামীন সমাজে এখনো এই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। মুচি নিজেই জুতো তৈরি করে বিক্রি করে……।"

এককথায় বলা যায়, স্পেনসার জৈবিক কার্যক্রমের তিনটি অবস্থা যথা ভরণপোষণ, বণ্টন এবং নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সামাজিক কার্যক্রম অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত অবস্থার এক মিল অনুধাবন করেছেন এবং এই সমন্বয়ই হচ্ছে স্পেনসারের বিবর্ত্তন-বাদের মূল ধ্যান ধারণা। স্পেনসার স্বভাবতই তাঁর চিন্তাধারাকে বিশেষ কোন এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। অর্থাৎ তাঁর চিন্তাধারা প্রায়শই দিক পরিবর্ত্তন করতো। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর "সামাজিক-জৈবিক" তত্ত্বটির ব্যবহারে যেখানে তিনি যা বিশ্বাস করেছেন তার স্বচ্ছতা এবং ভিত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্দিহান ছিলেন এবং যার জন্য সামাজিক বিবর্ত্তনবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বারবারই ভাবনার পরিবর্তন করেছিলেন। একসময়ে তিনি বললেন, সমাজ হল জৈবিক কাঠামো এবং কার্যক্রমের প্রতিভূ। আবার তিনিই বললেন—সমাজ, জৈবিক গঠন এবং কার্যক্রমের মতন। তাহলে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে স্পেনসারের বিবর্ত্তন-বাদ সংক্রান্ত তত্ত্ব একেবারে নির্ভুল এবং স্বচ্ছ নয়। তবুও স্পেনসারের তত্ত্ব বিবর্ত্তনবাদকে এক নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে যেখানে তিনি জৈবিক বিবর্ত্তনকেও প্রাধান্য দিয়েছেন অনেক বেশী। তিনি তাঁর "The Man Versus State" গ্রন্থে সমাজকে বহু-মুখীতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন অর্থাৎ সমাজ হল অনেক

মানুষের সমষ্টি। তিনি তাঁর "Principles of Sociology" গ্রন্থে বিবর্ত্তনবাদকে দুটি পর্য্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন যার প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে রয়েছে স্ব স্ব সামাজিক বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দুটি পর্য্যায়ক্রম :—

প্রথম পর্য্যায়ে স্পেনসার, সরল সমাজ থেকে জটিলতর সমাজের উন্নয়নের কথা আলোচনা করেছেন। সরল সমাজ হল এমন এক সমাজ যেখানে একক কার্যক্রমের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেই কার্যক্রম অন্য কোন কিছুর অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেই একক গঠন ও কার্যকারিতার অংশগুলি পরস্পরের মধ্যে এক সমঝোতার নিয়ম মেনে চলে। এই সরল সমাজের প্রকারভেদ নির্ভর করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমির সীমানার প্রকারভেদের উপর। এই সূত্রে স্পেনসার প্রদত্ত প্রথম পর্য্যায় ক্রমটি তুলে ধরছি।
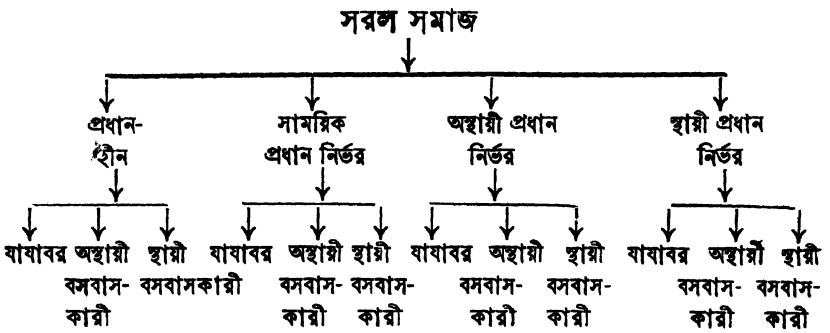
জটিলতর সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিকই একই রকম সমাজ বিবর্ত্তনের ধাপ কিংবা পর্য্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হয় :—
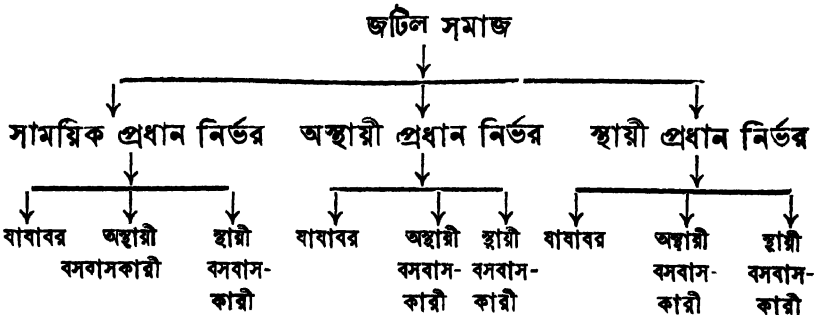
সরল ও জটিল সমাজ ছাড়াও স্পেনসার আরও দুই ধরণের দ্বিগুণ জটিল ও ত্রিগুণ জটিল সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রে তাঁর পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ :—
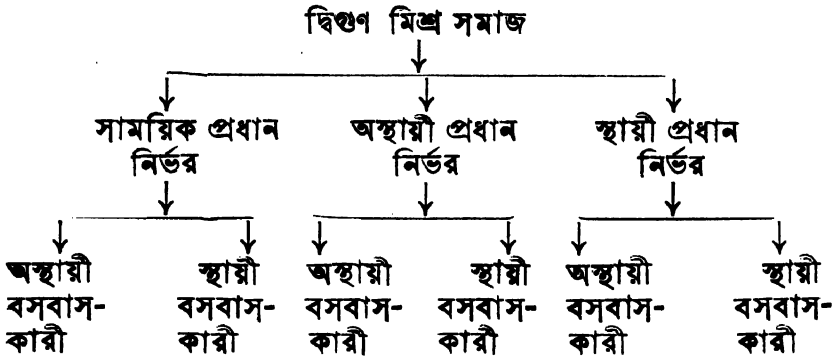
ত্রিগুণ মিশ্র সমাজ বলতে স্পেনসার, 'প্রাচীন মেক্সিকো', 'অসিরিয় সাম্রাজ্য', 'ইজিপ্টের .সভ্যতা,' 'রোম সাম্রাজ্য', গ্রেট ব্রিটেন,' ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া, প্রভৃতি বৃহৎ সভ্যতার কথা বুঝিয়েছেন এবং তাঁর মতে এই সভ্যতাই হোল অগ্রগতির প্রতিভূ। এই ধরণের পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করবার বেশ কয়েক বছর পর স্পেনসার আর এক নতুন অথচ সহজ পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করলেন। তিনি সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন যথা :—সমর-নির্ভর সমাজ ও শিল্প নির্ভর সমাজ। অবশ্য এই দুই স্তরের মাঝখানে এক ধরণের সমাজ পরিলক্ষিত হয় যাকে বলা হয় অবস্থান্তর প্রাপ্তি কালীন সমাজ। স্পেনসার অবশ্য তাঁর এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করে তাঁর তত্ত্বকে যুক্তিপূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে সবচাইতে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল স্পেনসারের প্রথম পরিকল্পনার তত্ত্বটিকে খারিজ করা এবং পরবর্ত্তী কোন তত্ত্বে তার উল্লেখ না করা। হয়ত এর মূল কারণ ছিল তাঁর জৈবিক সাদৃশ্য সম্পর্কিত তত্ত্বের দুর্বলতা। তাঁর দ্বিতীয় পরিকল্পনা কোঁত প্রবর্ত্তিত সমাজ প্রকার ভেদের সঙ্গে বেশ কিছুটা মিলে যায়। তাছাড়া

হেনরী মেইন, ডুর্যখ্যাইম্, টয়েনিজ, বেজহট্ এবং গিডিংসের সমাজ প্রকৃতির পার্থক্যজনিত তত্ত্বের সঙ্গেও স্পেনসার প্রবর্ত্তিত তত্ত্বের এক আশ্চর্য্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কোঁত্ প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	সমর নির্ভর সমাজ, আইন নির্ভর সমাজ ও শিল্প নির্ভর সমাজ।
স্পেনসার প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	সমর নির্ভর সমাজ ও শিল্প নির্ভর সমাজ।
মেইন প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	মর্যাদা ও চুক্তি।
টয়েনিজ প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	জেমেনশ্যাফ্ট ও জেসেলশ্যাফ্ট। (সম্প্রদায় ও সমিতি)
ডুর্যখ্যাইম্ প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	রীতি নির্ভর ঐক্য ও গুণ নির্ভর ঐক্য।
ম্যাক্স হেবার প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	ঐতিহ্যগত সমাজ ও যুক্তিসিদ্ধ সমাজ।
রেডফিল্ড প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব :	গ্রামীন সমাজ ও নগর সমাজ।

যাই হোক বর্তমানে স্পেনসার প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির কথা আলোচনা করাযাক। সমরনির্ভরসমাজ মূলতঃ যুদ্ধ বিগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং সেই সমাজের মানুষ সরকারের শাসনাধীন থাকে এবং সেইহেতু প্রত্যেক মানুষই এক কড়া নিয়মকানুনের গণ্ডীর মধ্যে থেকে দমনক্ষম দণ্ডের কাছে তাদের নতী স্বীকার করতে বাধ্য হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমর নির্ভর সমাজে সরকার এবং ধর্ম এই দুটি উপাদানই সামাজিক জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রনশক্তি হিসাবে কাজ করত। জনজীবন ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত জীবনধারাকে বাদ দিয়ে। শিল্প ছিল প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অধীনে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তার পদমর্য্যাদা হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হ'ত। কিন্তু শিল্প নির্ভর সমাজে এর ঠিক বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কারণ শান্তি স্থাপনই ছিল এই ধরনের সমাজব্যবস্থার মূলনীতি। বিকেন্দ্রীয় সরকার থাকার ফলে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং বিভিন্ন প্রকৃতির চিন্তাধারা ও বিশ্বাস যথেষ্ট গুরুত্ব

লাভ করত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনধারাকে বাদ দিয়ে জনজীবনের কথা চিন্তা করা হত না। শিল্পের বিস্তৃতি ছিল অনেক বেশী এবং তা রাষ্ট্রের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হত না। অপরপক্ষে রাষ্ট্র, শিল্পোন্নতির জন্য সবসময়ই সহযোগিতা করত। সামাজিক পদমর্য্যাদাকে তুলনায় গুরুত্ব দেওয়া হত না বরঞ্চ চুক্তির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হত অনেক বেশী যা ছিল সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মূল ভিত্তি।

স্পেনসারের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কীয় চিন্তাধারা ঃ—

সমাজতত্ত্ব বিষয়ে স্পেনসারের অবদান কতখানি তার মূল্যায়ন করতে হলে মোটামুটি তাঁর চিন্তাধারার দুটি দিকের উপর আলোকপাত করতে হয়। যথা জৈবিক—সামাজিক বিবর্ত্তন সম্পর্কিত মতবাদ এবং সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কিত চিন্তাধারা। প্রথম মতবাদ সম্পর্কে স্পেনসারের কিছু দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে সমাজের সঙ্গে জৈবিক গঠনও পদ্ধতির কোন অমিল নেই। অর্থাৎ 'কোষ' যদি কোন প্রাণীর একক হয় তাহলে "মানুষ" হল সমাজের একক। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে প্রাণীর "কোষ" সবসময়ই "স্থির" অবস্থাতে থাকে কিন্তু 'মানুষ' সবসময়ই গতিশীল। এই যদি ঘটনা হয় তাহলে স্পেনসার প্রদত্ত মতবাদের যুক্তিকে সমর্থন করা যায় না। অবশ্য স্পেনসার নিজেও তাঁর মতবাদের এই ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন।

———:০:———

ভিলফ্রেডো প্যারেটো ঃ—(Vilfredo Pareto)
(১৮৪৮-১৯২৩)

প্রস্তাবনা ঃ—

প্যারেটোর তত্ত্ব উপস্থাপন না করলে সমাজতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা অপূর্ণ রয়ে যায়। যদিও প্যারেটোর অবদানের পরিব্যাপ্তি এক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবুও তাঁর পরিমিত অথচ সুদৃঢ় চিন্তাধারা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক বিশেষ মর্য্যাদার আসন লাভ করেছে। যদিও প্যারেটো বৈজ্ঞানিক পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি রক্ষনশীলতাও মেনে চলতেন কারণ তিনি আধিবিদ্যক ধারণাকে পুঁজি করে রাজনীতির রক্ষনশীলতাকে সমর্থন করেছিলেন যা ছিল আধিভৌতিক-আধিদৈবিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস থেকে অনেক উপাদান উদাহরণ হিসাবে চয়ন করেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন সুবিন্যস্ত সমাজতত্ত্ব আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অন্যদিকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত তত্ত্বের উপরও আলোকপাত করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী ঃ—

১৮৪৮ সালে ইতালীতে ভিলফ্রেডো ফেডারিকো দামাসো প্যারেটো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল বুর্জোয়া প্রভুপুষ্ট এক সন্তান পরিবার। তাঁর পিতা প্রথম নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক প্রদত্ত "মারকুইসেট" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। ফলে প্যারেটো কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষালাভের পর ইঞ্জিনীয়ারিং পেশা গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তিনি তিনটি লৌহখনিতে ম্যানেজারের চাকুরীও করেন। এই সময় প্যারেটো

ইতালীর রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহী হন। তিনি অর্থনীতি বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন এবং বিভিন্ন অর্থনীতি বিষয়ক নিবন্ধ রচনাও করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ল্যুসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। যদিও তিনি অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তবুও ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যেখানে তিনি রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতির এক সমন্বয় ঘটান। পরবর্ত্তী বছরগুলিতে তিনি বিভিন্ন সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। প্যারেটো যদিও প্রতক্ষ্যভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশ্য মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি মুসোলীনী কর্ত্তৃক 'সেনেটর' নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি মারা যান।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :—

১) Les systemes socialistes, ১৯০২ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত। মূলগ্রন্থের কিছু অংশ ডি. মিরফিন কর্ত্তৃক "Vilfredo pareto, sociological writings" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

২) Trattato di Sociologia Generale, ১৯১৬-২৩ সালের মধ্যে ২ খণ্ডে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ অ্যাণ্ড্র-রনজিওরনো এবং লিভিংষ্টোন কর্ত্তৃক "The Mind And Society" নামে ৪ খণ্ডে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত এবং প্রকাশিত।

প্যারেটোর তত্ত্ব :—

যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক ব্যবহার :—

দৃষ্টবাদের আলোকে প্যারেটোই প্রথম যৌক্তিক এবং আযৌক্তিক সামাজিক কার্যক্রমের গঠন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে সমাজ জীবনের এক পার্থক্যজনিত অবস্থার কথা আলোচনা করেন। যুক্তিনির্ভর কার্যবিশ্লেষণের স্বপক্ষে যে বুদ্ধিমত্তা কাজ করে তার বিশ্লেষণ তেমন

দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু অযৌক্তিক ক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য এক বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানের প্রয়োজন কারণ অযৌক্তিক ক্রিয়া তুলনায় অনেক জটিল এবং দুর্বোধ্য। এই বিজ্ঞানকে প্যারেটো "সমাজতত্ত্ব" বলে অভিহিত করেন। কি কি ধরনের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ এই বিষয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বর্তমানে সে কথাই আলোচনা করা যাক। (১) এমন কিছু অহেতুক ক্রিয়াকলাপ সমাজজীবনে পরিলক্ষিত হয় যা বস্তুগত কিংবা বিষয়গত কোন দিক থেকেই কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না। (২) এমন কিছু কার্যকলাপ সমাজজীবনে পরিলক্ষিত হয় যা কেউ না কেউ উদ্দেশ্য সাধনের স্বপক্ষে বিচার করে অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন উদ্দেশ্যই সাধন করে না যেমন যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ। (৩) এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ সমাজজীবনে পরিলক্ষিত হয় যার একদা নিশ্চিত উদ্দেশ্য আছে অথচ কেউই সেই ক্রিয়াকলাপকে সচেতনভাবে অনুভব করতে পারেনা যেমন সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়াকলাপ এবং (৪) এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ সমাজে পরিলক্ষিত হয় যার উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিন্তু ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটেনা। যুক্তিনির্ভর ঘটনা এবং ক্রিয়াকলাপকে বিশ্লেষণ করার পর প্যারেটো অযৌক্তিক ঘটনা এবং ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্যারেটোর মতে এমন কিছু তত্ত্ব আমাদের সমাজজীবনে আলোচিত হয় যা অযৌক্তিক, এবং বিশ্বাস ও বক্তব্য এই ধরনের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে এই ধরনের অযৌক্তিক তত্ত্ব প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও প্রমাণিত তত্ত্বের গঠন, প্রকৃতি ও বিন্যাস বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। এই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি "যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক" কার্যকলাপের মধ্যে এক পার্থক্য নিরূপণ করতে প্রয়াসী হন। যৌক্তিক কার্যকলাপকে তিনি বিচারবুদ্ধি নির্ভর এক অবস্থা বলে বর্ণনা করেন এবং অযৌক্তিক "কার্যকলাপ তাঁর মতে, মানসিক অবস্থা, ভাবপ্রবনতা, অবচেতন অনুভূতি ইত্যাদি অবস্থা থেকে উদ্ভূত"। যুক্তিনির্ভর ঘটনাতে মানুষের

ব্যবহার এবং কার্য্যপদ্ধতি সহজেই পরিস্ফুট হয় এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব গড়ে ওঠে তা যেমন সহজেই প্রনিধানযোগ্য এবং কোন বিশেষ ঘটনার সাপেক্ষে সহজেই অনুমেয়। তেমনি যুক্তিহীন ঘটনাতে মানুষের যে ধরনের ব্যবহার প্রতিফলিত হয় তা মূলতঃ ভাবপ্রবনতা এবং মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তিরই নামান্তর মাত্র। মানবজীবনেও এই যুক্তি নির্ভর এবং যুক্তিহীন অবস্থাজনিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং তা প্রতীয়মান হয় তাদের ব্যবহার সম্পর্কিত উপলব্ধিবোধের মধ্যে যা বিশ্বাস এবং ভাবপ্রবনতা থেকেই উদ্ভূত। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় অযৌক্তিক কার্যকলাপ যুক্তিনির্ভর কার্যকলাপেরই এক পরিণতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মানুষের সবসময়ই হত্যাকাণ্ডে একটি কার্যভীতি থাকে এবং সে সাধারণতঃ এই ধরণের ঘটনায় লিপ্ত হতে চায় না এবং সে এই ধারণাই পোষণ করে যে ঈশ্বর হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়। উপরোক্ত ঘটনা এক ধরনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই ধরনের তত্ত্বের অস্তিত্ব অবশ্য মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে বজায় থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যবহার, মানসিক অবস্থা এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে এক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যে পদ্ধতিতে প্যারেটো উপরোক্ত সম্পর্ক নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাকে যুতসিদ্ধাবয়ব পদ্ধতি বলে প্যারেটো আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য প্যারেটো অযৌক্তিক ঘটনা কিংবা ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা এবং এই ধরনের ঘটনা যে সামাজিক বিন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য, সে সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষমই হয়েছিল বলা যায়। প্যারেটো অবশেষে ভাবপ্রবনতার ব্যাখ্যা এবং কিভাবে ভাবপ্রবনতা চিন্তাধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন এবং তাঁর আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল 'অধঃক্ষেপ' এবং 'ব্যুৎপত্তি'র পর্যালোচনা করা।

অধঃক্ষেপ এবং ব্যুৎপত্তিজনিত তত্ত্ব ঃ—

প্যারেটোর কথায় "অধঃক্ষেপ মানুষের কিছু সহজাত প্রবৃত্তিকে

সংযুক্ত করে এবং সেই কারণে মানুষ স্থির লক্ষ্যে পৌছাতে চায়"। অধঃক্ষেপ কথাটির ব্যবহার প্যারেটো সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত ভাবপ্রবণতার স্বপক্ষে আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে অধঃক্ষেপ হল ভাবপ্রবনতারই এক অভিব্যক্তি। অধঃক্ষেপ পরিবর্তনশীল নয় এবং অধঃক্ষেপ হল মানব জীবনের অপরিবর্তনীয় উপাদান। অধঃক্ষেপকে কখনো কখনো সংস্কার বলেও মনে করা যেতে পারে। যখন কোন যুক্তি নির্ভর ঘটনা বিশ্লেষিত হয় তখন যা অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে সেই অবশিষ্ট উপাদানকেই প্যারেটো আলোচনা করেছেন। প্যারেটো এই ধরণের অধঃক্ষেপকে ছটি ভাগে ভাগ করেন।

ক) **সংযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত প্রবৃত্তি ঃ—**

প্যারেটোর মতানুসারে মানবজাতির সবসময়ই বস্তু কিংবা অবস্থার মধ্যে এক পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করার বাসনা দেখা যায়। কখনো কখনো দেখা যায় অবস্থার মধ্যে মিলও থাকে আবার কখনো বা অমিলও লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের পারস্পরিক সংযোগ কখনো বা মানবজাতিকে উৎসাহিত করে কখনো বা মানবজাতির মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে।

খ) **সমষ্টির স্থায়িত্ব ঃ—**

এই ধরণের প্রবৃত্তিবোধ মানব জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক সম্পর্ক, কোন জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক, সামাজিক শ্রেণী, মৃত এবং জীবিতের মধ্যে সম্পর্ক এবং মৃত ও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কের (যা জীবিত থাকাকালীন বিদ্যমান ছিল) ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর স্থায়িত্ববোধজনিত প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। কখনো কখনো বিমূর্ত্তনের ব্যবহার এই ধরণের স্থায়িত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

গ) তৃতীয় অধঃক্ষেপ এমন কিছু চাহিদার ইঙ্গিত বহন করে যার মধ্য দিয়ে ভাবপ্রবণতা বাহ্যিক কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে তার

অস্তিত্ব ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে।

ঘ) চতুর্থ অধঃক্ষেপ সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে এবং মানবজীবনের নিয়মানুবর্তীতাকে সুসংহত করতে সাহায্য করে। মধ্যযুগীয় গিল্ডদের মধ্যে এবং আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নে এই ধরণের নিয়মানুবর্তীতা লক্ষ্য করা যায়।

ঙ) পঞ্চম অধঃক্ষেপ মানবজাতির সংহতি রক্ষার সহায়ক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার প্রচেষ্টা কিংবা সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তনের বিপক্ষে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা এই ধরণের অধঃক্ষেপকে সূচিত করে। এই সূত্রে প্যারেটো সমাজের সমরূপতা (Homeostasis)র কথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে সমাজের ভারসাম্য একবার যদি নষ্ট হয় তবে তা বিপর্যায়ের পথেই পা বাড়ায়। এই জাতীয় অধঃক্ষেপের আর একটি দৃষ্টান্ত হল সমতা সম্পর্কিত ভাবপ্রবণতা। ক্রোধ সম্পর্কিত ভাবপ্রবণতাও আর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে প্যারেটো উল্লেখ করেন।

চ) ষষ্ঠ অধঃক্ষেপ হল যৌন সম্পর্কিত প্রবৃত্তি। যৌনতাকে ঘিরে বহু ভাবপ্রবণতা গড়ে ওঠে যেমন বৈধতা, ব্যাভিচার, কুমারীত্ব এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস।

ব্যুৎপত্তি :—

প্যারেটো চার রকমের ব্যুৎপত্তির কথা উল্লেখ করেন। এই ধরণের ব্যুৎপত্তি হল মানুষ যে ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করে তারই ন্যায়সিদ্ধ এক অবস্থা। প্রথম শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি হল ঘটনার দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্ব তা সে ঘটনা স্বতঃসিদ্ধই হোক কিংবা যুক্তিহীনই হোক। কখনো কখনো দেখা যায় ঘটনার দৃঢ়তার সঙ্গে ভাবপ্রবণতার এক সমন্বয় ঘটে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। এই ধরণের কর্তৃত্ব কোন এক বিশেষ ব্যক্তির কিংবা অনেক ব্যক্তির হতে পারে।

কর্তৃত্বের গঠন বৈশিষ্ট্য কখনো বা রক্ষা মূলক হতে পারে আবার কখনো বা প্রথানুযায়ী হতে পারে। কিন্তু প্যারেটোর মতে কর্তৃত্ব হল এক স্বর্গীয় অবস্থা যা প্রগতি কিংবা সত্যনির্ভর বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি হল সেই ধরণের ন্যায়সিদ্ধ অবস্থা যা কোন ব্যক্তির ব্যবহার এবং ভাবপ্রবণতাজনিত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত এবং এই ধরণের ব্যুৎপত্তি মানবজাতির ভাবপ্রবণতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। এর আর এক ধরণের গঠন দেখা যায় তখন, যখন কোন ব্যক্তি কাজে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রতী হয় অর্থাৎ তাকে বোঝান হয় যে কাজটি তার স্বার্থের অনুকূল কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। ন্যায়সিদ্ধ অবস্থা অনেকাংশে আধিবিদ্যক অবস্থা অর্থাৎ "ন্যায়বোধ" কিংবা "অধিকতর উত্তম অবস্থা"......। এই সূত্রে প্যারেটো কান্টের 'Categorical imperatives' কে তাঁর তত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং তিনি এই ধরণের ব্যুৎপত্তিকে অতীন্দ্রিয়বাদের সপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি হল বাচনিক প্রমাণ সম্পর্কিত অবস্থা। এইভাবে প্যারেটো অধঃক্ষেপ এবং ব্যুৎপত্তিজনিত তত্ত্বের প্রবর্ত্তন করেন এবং দুটি প্রশ্ন এই সূত্রে তুলে ধরেন।

ক) কি করে উপরোক্ত তত্ত্ব দুটি কার্যকর হয় এবং খ) সামাজিক উপযোগিতার ওপর অধঃক্ষেপ এবং ব্যুৎপত্তির প্রভাব কতখানি?

এখানেই প্যারেটো "কার্যনিষ্ঠ সম্পর্কিত" চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন। প্যারেটো পরবর্তীকালে সমাজবিন্যাসের উপাদান আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। অধঃক্ষেপ এবং ব্যুৎপত্তিজনিত ধর্মের প্রেক্ষাপটে অবশ্য সমাজবিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক উপাদানের কথাও (যেমন অর্থনৈতিক উপাদান, মানবজাতির অসদৃশ এবং অসমসত্ত্ব সম্পর্কিত উপাদান, মানবজাতির সামাজিক গতিশীলতা এবং

ক্ষমতাশালীর চক্রবৎ আবর্ত্তন) তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তবে প্যারেটো সফলতা এবং কৃতিত্ব অর্জন করেন "ক্ষমতাশালীর চক্রবৎ আবর্ত্তন" নামক তত্ত্বটির প্রবর্ত্তন করে।

ক্ষমতাশালীর চক্রবৎ আবর্ত্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব ঃ—

প্যারেটোর সামাজিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব মূলতঃ উদ্ভূত হয়েছে সামাজিক ভারসাম্যের বিন্যাস সম্পর্কিত ভাবধারা থেকে যেখানে সময়ের সাথে পা ফেলে উপাদান তার মূল্যবোধ বদলায়। প্যারেটোর মতে, পরিবর্তন সবসময়ই চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয়, কখনোই সরল পথ ধরে অগ্রসর হয় না। এই পরিবর্তনই সামাজিক বিন্যাসকে সূচিত করে। প্যারেটোর মতে সমাজ কিছু ক্ষমতাশালী ব্যক্তি অর্থাৎ 'এলিট' এবং সাধারণ মানুষ অর্থাৎ 'মাস্' নিয়ে গঠিত। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আবার দুই ধরণের পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে। যেমন একদল সরাসরি শাসনক্ষমতার অধিকারী এবং আর একদল শাসনযন্ত্র সমর্থিত বেসকারী অথচ সামাজিক পদপর্য্যাদার অধিকারী। প্যারেটো এই সূত্রে "শৃগাল এবং সিংহ" সম্পর্কিত তত্ত্বের উপস্থাপনা করে ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মধ্যে এক পার্থক্য বুঝিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও প্যারেটো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দুই ধরণের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেন। একদল হল ফাটকাবাজ, যাদের সঙ্গে শৃগালের যোগাযোগ রয়েছে এবং আর এক দল হল প্রজা, যারা সিংহের কাছে বাঁধা। এই ধরণের অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীকে সহজেই প্রভাবান্বিত করে। "ফরাসীতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফাটকাবাজদের নেতা হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি নেপোলিয়ান তৃতীয় হিসাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।" প্যারেটো অবশ্য আরো অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন এবং অতঃপর তিনি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর সম্পর্কজনিত এক বিশ্লেষণ করেন। প্যারেটোর এই সূত্রে উল্লেখ্য একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

"ফাটকাবাজদের কাছে অর্থনৈতিক উন্নতির সময়কাল ছিল অনুকূলে যারা ক্রমে ক্রমে বিত্তবান হয়ে উঠেছিল এবং যে সমস্ত অঞ্চল তাদের আওতায় ছিল না তা তারা দখলে নিচ্ছিল। কিংবা যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ কিংবা স্থির তাদের কাছে সেই সময়কাল ছিল প্রতিকূল। শেষোক্ত শ্রেণী সেই কারণে ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে পড়ছিল কারণ দ্রব্যাদির মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ফাটকাবাজদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় তারা পেরে উঠছিল না"। প্যারেটোর সমাজবিন্যাসের তত্ত্বটি মূলতঃ ছিল রাজনৈতিক বিন্যাস-তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল এবং রাজনৈতিক বিন্যাসে মূলতঃ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল অনেক বেশী। ট্যালকট্ পারসনস্ অবশ্য প্যারেটোর তত্ত্ব সমালোচনা করে বলেছেন যে প্যারেটো অধঃক্ষেপ সংক্রান্ত তত্ত্বে সেইসব অবস্থাকে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি যা অধঃক্ষেপের পরিবর্তনকে সূচিত করে। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি জৈবিক এবং সাধারণ কারণের কথা উল্লেখ করেন নি। প্যারেটোর তত্ত্ব অনেকাংশে আধিবিদ্যক চিন্তাধারাকে সূচিত করে যার ব্যবহারিক প্রয়োগমূল্য তুলনায় অনেক কম। তিনি নিজে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন সুতরাং তাঁর তত্ত্বেও তাঁর পারিবারিক মূল্যবোধ যা সেকালের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে সূচিত করে, ফুটে উঠেছে। অবশ্যই তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্বের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে বুর্জোয়া প্রভুদের আচার আচরণ এবং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার কথাই তিনি আলোচনা করেছেন অনেক বেশী। সেই কারণে প্যারেটোকে "বুর্জোয়াদের কার্ল মার্কস্" বলা হয়। যাই হোক না কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্যারেটোর তত্ত্বের গুরুত্ব এখনো অপরিসীম।

——):::(——

এমিল ড্যুরখ্যাইম্ (Emile Durkheim)

(১৮৫৮-১৯১৭)

প্রস্তাবনা :—

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল ড্যুরখ্যাইমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড্যুরখ্যাইম্ বিবর্ত্তনবাদ সম্পর্কিত সমাজতত্ত্বকে উপেক্ষা তো করেন নি বরঞ্চ তাঁর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সমাজ বিবর্ত্তনের কিছু মূল নীতির প্রবর্ত্তন করা। যদিও তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করেন নি তবুও তাঁর এই আংশিক ব্যর্থতা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। অবশ্য ড্যুরখ্যাইমের দার্শনিক চিন্তাধারা এবং ধ্যানধারণা সমাজতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সমাজ কি ভাবে গড়ে ওঠে, মূলতঃ কি কি কারণ সমাজ পরিবর্তনের জন্য দায়ী, মানব জীবনের কোথায় সামাজিক অবস্থা নিহিত থাকে এবং সমাজবিজ্ঞান প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা— এই ছিল ড্যুরখ্যাইমের গবেষণার মূল উপাদান। ড্যুরখ্যাইম্ যদিও উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি—যদিও তাঁর মৃত্যুর সময় অধিকাংশ সমস্যাই অমীমাংসিত ছিল তবুও তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচক্ষণতা সমাজতত্ত্বকে দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। যে সমস্যাগুলির ওপর তিনি আলোকপাত করেছিলেন সেগুলি যদিও নতুন নয় তথাপি ড্যুরখ্যাইম্ সেই সমস্যাগুলি নতুন ভাবনার আলোকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। ফলে ড্যুরখ্যাইম্ সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে স্থান লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী :—

ড্যুরখ্যাইম্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্ভূক্ত ল্যোরেইন প্রদেশের

ইপিনাল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু হিসাবে দ্যুরখ্যাইম্ কখনো Anti-semitism দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি কারণ ফ্রান্স তা থেকে ছিল মুক্ত। তাঁর যৌবনকাল "Republicanism", "Royalism" এবং "Bonapartism"-এর প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র-জীবনের মধ্যে কেটেছে। তাঁর সমাজ সম্পর্কিত ধারণা—তাঁর নৈতিক প্রকৃতিভিত্তিক সমাজের ধারণা এবং শিক্ষানীতি সম্পর্কিত চিন্তাধারা মূলতঃ রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে উদ্ভুত। অবশ্য তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাও যে তাঁর মতবাদকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর পিতা ছিলেন একজন "ইহুদী রাব্বি"। ইকোলি নরম্যালিতে তিনবছর শিক্ষান্তে তিনি দর্শন পড়াতে শুরু করেন। তিনি জার্মানীতেই তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। তিনিই প্রথম বোঁরদে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়টির পঠন পাঠন শুরু করেন। তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে "Pedagogy" চেয়ার অর্জন করে সম্মানিত হন। দ্যুরখ্যাইম্ ১৯১৭ সালে মারা যান।

দ্যুরখ্যাইম্‌ লিখিত গ্রন্থপঞ্জী :—

১) "De la Division du travail Sociale", ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত। জর্জ সিম্পসন কর্তৃক মূল বইটি "The Divison of Labour in society" নামে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত।

২) "Les Regles de la methode Sociologique "১৮৯৫ সালে প্রকাশিত। মূল বইটি সোলোভে এবং ম্যুলার কর্তৃক "The Rules of Sociological Method" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৩) Le Suicide, ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত। মূল বইটি জর্জ সিম্পসন কর্তৃক "Suicide" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৪) Les Formes elementaires de la vie religieuse" ১৯১২ সালে প্রকাশিত। মূল বইটি জে. ডব্লু স্যোয়েন কর্তৃক

"The Elementary Forms of Religious Life" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৫) "Education of Sociologie", ১৯২২ সালে প্রকাশিত। মূল বইটি এস. ডি ফক্স কর্ত্তৃক "Education and Sociology" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৬) Sociologie et Philosophie, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত। মূল বইটি ডি. এফ. পোকক্ কর্ত্তৃত "Sociology and Philosophy" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৭) Lecons de Sociologie ১৯৫০ সালে প্রকাশিত। মূল বইটি সি. ব্রুকফিল্ড কর্ত্তৃক "Professonal Ethics and Civic Morals" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৮) Jugements de Valeur et Jugements de realite" (Value Judgement and reality Judgement) ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্টবাদ সম্পর্কিত চিন্তাধারা :—

দ্যুরখ্যাইম্ মূলতঃ কোঁত প্রবর্ত্তিত প্রত্যক্ষবাদনীতির সমর্থনে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সমাজতত্ত্ব হল প্রাকৃত বিজ্ঞান। দৃষ্টবাদ নীতি হল বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এবং দর্শন হল ধারণার শেষ অবস্থা। শুধুমাত্র নিরীক্ষিত ঘটনা এবং তৎসম্পর্কিয় মতবাদই যুক্তিগ্রাহ্য এবং সমাজতত্ত্ব সেই দর্শনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত ধ্যানধারণাই দ্যুরখ্যাইমের "The Rules of Sociological Method" গ্রন্থের মূল কথা। তাঁর পরবর্ত্তী চিন্তাধারা অবশ্য দৃষ্টবাদতত্ত্বকে তেমনভাবে মেনে চলেনি এবং তিনি আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজকে এক নতুন সামাজিক প্রজাতি হিসাবে গণ্য করেছিলেন। দ্যুরখ্যাইম্ স্পেনসারের সমর নির্ভর এবং শিল্পনির্ভর সমাজের বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি টয়েনিজ প্রবর্ত্তিত "জেমেনশ্যাক্ট ও জেসেলশ্যাক্ট"

এর মধ্যেকার সামাজিক রীতির পরিবর্তনের তত্ত্ব সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। উপরোক্ত তত্ত্ব দুটি থেকে তিনি এক নতুন ধরনের সামাজিক রীতির কথা বিশ্লেষণ করলেন যার থেকে "সামাজিক সংহতি" কথাটি উদ্ভূত হল।

শ্রমবিভাগ সম্পর্কিত তত্ত্ব :—

শ্রমবিভাগ সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনাকালে দ্যুরখ্যাইম্ দুই ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ করেন : যে সংহতি কখনো রীতি নির্ভর এবং কখনো গুণ নির্ভর।

প্রাচীনকালে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একই ধরণের চরিত্র বিদ্যমান ছিল। ধ্যানধারণা, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীতেও তারা ছিল এক ও অভিন্ন। তার ফলে মূল্যবোধ এবং অভিজ্ঞতার কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না এবং একেই বলা হল রীতিনির্ভর সংহতি (Mechanical Solidarity)। কিন্তু শিল্পনির্ভর সমাজের উত্থানের ফলে এ ধরনের সংহতি আর দীর্ঘস্থায়ী হল না অর্থাৎ সেখানে ভাবনা চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধের পার্থক্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হল। ফলে শ্রম বিভাজন সম্পর্কিত ধারণা দ্যুরখ্যাইম্ সমাজতত্ত্বে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে প্রবর্তন করলেন যা সমাজ সংহতি নিরূপন করার এক মস্ত হাতিয়ার।

যে সমাজের সংহতি রীতিনির্ভর (Mechanical) সেখানে সমাজজীবন এবং মানবজীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক। সেখানে সাধারণ আইন এবং রীতিসিদ্ধ আইন ছিল দমনমূলক এবং সামাজিক পাপের বিচার হত সমষ্টিগত বিচারের মাপকাঠিতে। কিন্তু যে সমাজের সংহতি গুণনির্ভর সেখানে নিবৃত্তমূলক আইনের উপর জোর দেওয়া হয় অনেক বেশী এবং পদাধিকারের মর্য্যাদার উপর আইন প্রতিষ্টিত হয়। দ্যুরখ্যাইমের মতে আদিম সমাজে অপরাধ ছিল জনগণ ভিত্তিক কিন্তু আধুনিক সমাজে অপরাধ হল ব্যক্তি নির্ভর। যদিও দ্যুরখ্যাইম্ শ্রম বিভাজনের উপর তাঁর বিষয়বস্তু

কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তথাপি তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল "নিয়মের" কথা বিশ্লেষণ করা যাকে তিনি বলতেন "সামাজিক কারণ" (Social factor) এবং তিনি মনে করতেন সমাজতত্ত্বই হল সেই বিষয় যা সামাজিক কার্যকারণকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। ডুারখ্যাইম্ বলতেন, যে নিয়ম ও আইন এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতা যা নৈতিক ভাবে প্রত্যেকটি মানুষকে বাধ্যতা এবং সামাজিক চাপের উপর রাখতে বাধ্য করে এবং এই অবস্থাকেই বলা হয় "সামাজিক ঘটনা"। ডুারখ্যাইমের মতে সমাজতত্ত্বের বিষয় হল এই সামাজিক ঘটনার আলোচনা করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে প্রত্যেকটি শিল্পনির্ভর সমাজে অপরাধ হল একটি সামাজিক ঘটনা। বিবাহ বিচ্ছেদ, মদ্যপান, আত্মহনন ইত্যাদি ঘটনাও সামাজিক ঘটনার নামান্তর মাত্র। ডুারখ্যাইমের মতে সামাজিক ঘটনা হল যে কোন কার্যকারণের প্রকৃতি যা মানুষের উপর বহিঃচাপের সৃষ্টি করে। যদি মানুষ আইন নামক সামাজিক ঘটনার বহিঃচাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে এমন কিছু সামাজিক ঘটনাও আছে যার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যা পুরোপুরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই সূত্রে ডুারখ্যাইম্ বললেন যে সমাজতাত্ত্বিকের দায়িত্ব হল সেই পরিসংখ্যানের মাত্রা নিরূপন করা যা সামাজিক ঘটনা প্রতিফলিত করে—যেমন অপরাধের মাত্রা, আত্মহননের মাত্রা, বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রা, মদ্যপানের মাত্রা ইত্যাদি।

আত্মহনন সম্পর্কিত তত্ত্ব :—

আত্মহনন হল সামাজিক সংহতির এক অবক্ষয়। নেতিবাচক সামাজিক ঘটনাকেই আত্মহননের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। এক কথায় বলা যায় কোন সামাজিক চাপের ফলেই আত্মহননের ঘটনা ঘটে থাকে। কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানী মনস্তত্ত্বের আলোকে আত্মহননের বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ কেউ আবার মানসিক হতাশা, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, অথবা ব্যর্থ প্রেমকে আত্মহননের জন্য দায়ী

করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত কোন বিশ্লেষণই আত্মহননের মাত্রাকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়নি। ড্যুরখ্যাইম্ প্রথম আত্মহননকে সমাজতত্ত্বের আলোয় বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে আত্মহননের শ্রেণীবিন্যাস সবসময়ই সমাজতত্ত্বভিত্তিক। দলগত সংহতি এবং বিচ্যুতির মাপকাঠিতে তিনি তিন ধরনের আত্মহননের কথা উল্লেখ করেছেন যথা:—ক) ইগোইষ্টিক আত্মহনন খ) অ্যানোমিক আত্মহনন গ) অলট্রুয়িসটিক আত্মহনন।

ইগোইষ্টিক আত্মহনন:—

এই ধরণের আত্মহননের ঘটনা সাধারণতঃ দলগত সংহতির বিচ্যুতির ফলেই ঘটে থাকে। ড্যুরখ্যাইম্ পরিসংখ্যান জনিত প্রমাণ দাখিল করে দেখিয়েছেন যে সন্তানহীন বিবাহিত মানুষের মধ্যে আত্মহননের মাত্রা সন্তানসহ বিবাহিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। কিংবা যারা অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার কিংবা বিধবা অথবা বিপত্নীক তাদের মধ্যে আত্মহননের মাত্রা বিবাহিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

অ্যানোমিক আত্মহনন:—

অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে অনেক সময় আত্মহননের মাত্রা বেড়ে যায়। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় মানুষের আশা প্রত্যাশা যখন ব্যর্থ হয় তখনই এই ধরনের আত্মহননের ঘটনা ঘটে থাকে।

অলট্রুয়িসটিক আত্মহনন:—

সামাজিক কার্যকারণে কিংবা আরো সহজ অর্থে পরের নিমিত্তে আত্মোৎসর্গ কিংবা মহৎ কিছুর জন্য আত্মহননের ঘটনাকে "অলট্রুয়িসটিক আত্মহনন" বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন কোন মানুষ অসম্মানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আত্মহনন করে কিংবা হিন্দু বিধবার সহমরন নীতি (সতীদাহ প্রথা) ইত্যাদি এই ধরনের আত্মহননের অন্তর্ভূক্ত।

উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাসকে পর্যালোচনা করে বলা যায় যে প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু আশা প্রত্যাশা থাকে। যখন

কোন কারণে সেই প্রত্যাশা নিস্ফল হয় কিংবা উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তখনই মানসিকতার ভারসাম্য যায় হারিয়ে—ফলে সৃষ্টি হয় কিছু মানসিক চাপ এবং যার ফলশ্রুতি হল আত্মহনন।

দ্যুরখ্যাইমের এই শ্রেণীবিন্যাস প্রকৃতপক্ষেই পাণ্ডিত্য নির্ভর কিন্তু পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত নয়। ইউরোপে প্রোটেসট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে আত্মহননের মাত্রা পর্যালোচনা করে দ্যুরখ্যাইম্ দেখেছেন যে প্রোটেসট্যান্ট ধর্মাবলম্বী দেশে আত্মহননের মাত্রা ক্যাথলিকদের চাইতে অনেক বেশী। তাঁর নিজের ব্যাখ্যা হল ক্যাথলিকগণ তাদের নিজেদের দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে খুবই আন্তরিকভাবে এবং ঘনিষ্টভাবে যুক্ত (সামাজিক ও ব্যাক্তিগত জীবনে)। অপরপক্ষে প্রোটেসট্যান্টগণ তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে ও সামাজিক আচরনে নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্যাথলিকদের মত আবদ্ধ নয়। সুতরাং তাদের গোষ্ঠীজীবনে সংহতির অভাব থাকার ফলেই আত্মহননের মাত্রা অনেক বেশী। ট্যালকট পারসনস্ অবশ্য দ্যুরখ্যাইমের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে বলেছেন যে দ্যুরখ্যাইমের এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপক্ষে তেমন কোন প্রমাণ নেই। তাঁর মতে গোষ্ঠীজীবনের সংহতির চাইতেও তাঁদের মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচরন আত্মহননের জন্য দায়ী বলে পরিগণিত হতে পারে।

"সামগ্রিক বিবেকবোধ" সম্পর্কিত তত্ত্ব :—

সামগ্রিক বিবেকবোধের অর্থ হল মানবজাতির বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ও ভাবপ্রবণতার সমষ্টি যা যে কোন সমাজের নাগরিকের মধ্যেই মোটামুটি বিদ্যমান। দ্যুরখ্যাইমের মতে বিবেকবোধ হল এক নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পন্ন নিরূপক পদ্ধতি।

আদিম সমাজে "সামগ্রিক বিবেকবোধের" অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সামাজিক ধারা আলোচনাকালে তিনি এই তত্ত্বটির আলোচনা করেছিলেন বটে তবুও তিনি আবার তার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তার একমাত্র কারণ হল আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজের

মূল্যাবোধকে বিশ্লেষণ করা। এই সূত্রে হ্যারখ্যাইম্ সামগ্রিক বিবেকবোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবেকবোধের এক পার্থক্য নিরূপন করেছিলেন। তাঁর আলোচনায় তিনি আবার 'Anti Reductionist' মতবাদ প্রবর্ত্তন করলেন, এবং বললেন যে কোন সমাজেই মূল্যবোধের এক স্তরবিন্যাস রয়েছে যা কোন ব্যক্তিনির্ভর মূল্যবোধের কাছে অস্তিত্ব হারায় না। "মূল্যবোধের বিচার ও বাস্তবতার বিচার" নিবন্ধে তিনি ব্যক্তিগত পছন্দ অর্থাৎ বাস্তবতা সম্পর্কীয় মতামতের সঙ্গে মূল্যবোধ সম্পর্কীয় মতামতের এক পার্থক্য নিরূপন করেন। (যথা "আমি ওয়াইন অপেক্ষা বীয়ার পছন্দ করি" বনাম "এই ছবিটির সৌন্দর্য্যজনিত এক মূল্য রয়েছে") উপরোক্ত মূল্যবোধের বিচার করা যেতে পারে শুধুমাত্র কোন আদর্শভিত্তিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্ব :—

ধর্মীয় ব্যবহার আলোচনাকালে হ্যারখ্যাইম্ দুই ধরনের অবস্থা যথা "ধর্মীয়" এবং "ধর্মনিরপেক্ষ" অর্থাৎ "পবিত্র" এবং অপবিত্র" অবস্থার সঙ্গে এক পার্থক্য নিরূপন করেন। ধর্ম সব সময়ই পবিত্র অবস্থা বা বস্তুর অবস্থা সূচিত করে। যখনই কোন মানুষ পবিত্র কোন অবস্থা বা বস্তুর সঙ্গে আবিষ্ট রয়েছে বলে মনে করে তখন থেকেই সে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং পার্থিব জীবনের চাহিদার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে। সামাজিক জীবনের মূল সুর হল মানুষের মনের এক সম্মেলন। মানুষের মন যখন একই লক্ষ্যপথে পরিচালিত হয় তখন ব্যক্তিস্বার্থ থাকে অবদমিত। কখনো কখনো সম্পর্কের এই সম্মেলনের ফলে উদ্ভুত হয় এক নতুন ধরনের ভাবপ্রবনতা যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবপ্রবনতা থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা বহন করে। এর ফলশ্রুতি হল সৃষ্টিমূলক নতুন এক অবস্থা অর্থাৎ এক নতুন "আদর্শ"। এইভাবে সৃষ্টি হয় সামাজিক মূল্যবোধের। হ্যারখ্যাইম্ তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু ঐতিহাসিক প্রমাণের

উল্লেখ করেছেন। (দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইউরোপে Scholasticism-এর অগ্রগতি প্যারিসে Scholar-দের সম্মেলন ও সম্পর্কেরই ফলশ্রুতি)। উদাহরণস্বরূপ নবজাগরণ ও সমাজ সংস্কারের কথাও এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। দ্যুরখ্যাইম্ ধর্মকে সামাজিক এক বিষয়বস্তু বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে জানবার তাঁর ছিল এক বিরাট আগ্রহ। অষ্ট্রেলীয় আদিম অধিবাসীদের সমাজকে তিনি পৃথিবীর সবচাইতে আদিম সমাজ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যার সুবিধার্থে। কারণ "অরুনতাস্" অধিবাসীদের "টোটেমবস্তু" শুধুমাত্র ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাদের গোত্রের সঙ্গে ছিল তার অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। তারা "টোটেম"কে এক ধর্মীয় এবং পবিত্র বস্তু বলে মনে করত অর্থাৎ টোটেম ছিল তাদের কাছে এক পবিত্র প্রতীক। দ্যুরখ্যাইমের সমাজ সম্বন্ধীয় ভাবধারা সবসময়ই ধর্মীয় ছিল, কখনো বস্তুতান্ত্রিক ছিলনা।

দ্যুরখ্যাইমের সমাজতাত্ত্বিকমূলক গবেষণা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে তিনি সমাজতত্ত্বকে অপরাপর সমাজবিজ্ঞান থেকে আলাদা করে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজ বিবর্ত্তন কখনোই এক খাতে বইতে পারে না বরঞ্চ জটিলতর পথেই অগ্রসর হয়। সর্বোপরি বলা যায় দ্যুরখ্যাইম্ তাঁর মতবাদ এবং গবেষণার মধ্যে তাঁর পারদর্শীতা এবং দূরদর্শীতার প্রমাণ রেখেছেন। সোরোকিনের একটি উক্তি এই সূত্রে তুলে ধরছি :

"তিনি (দ্যুরখ্যাইম্) ভাগ্যবশতঃ তাঁর উদার যুক্তিযুক্ত এবং দার্শনিক পারদর্শীতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের সন্দিগ্ধ এবং যত্নশীল পদ্ধতির সম্মেলন ঘটিয়েছেন"।

——:০:——

ফ্র্যাঙ্কলিন গিডিংস (Franklin Giddings)
(১৮৫৫-১৯৩১)

১৮৫৫ সালে গিডিংসের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন কানিকটিকাটের মন্ত্রীপুত্র। স্কেনেকটাডির অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন কলেজে তিনি তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। যদিও তাঁর বিষয় ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং তবুও তিনি প্রথম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বে গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করেছিলেন। দশ বছর ধরে তিনি সাংবাদিকের কাজ করেন। ১৮৮৮ সালে ব্রায়ান মেয়র কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ সালে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে সম্মানিত হন। "The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences"র তিনি ছিলেন অন্যতম এক প্রতিষ্ঠাতা। শুধু তাই নয় "American sociological society"র তিনি ছিলেন তৃতীয় সভাপতি। ১৯৩১ সালে তিনি মারা যান।

তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল :—

১) The Principles of Sociology, (১৮৯৬ সালে প্রকাশিত)
২) The Elements of Sociology, (১৮৯৮ সালে প্রকাশিত)
৩) Studies in the Theory of Human Society, (১৯২২ সালে প্রকাশিত)
৪) The Scientific Study of Human Society, (১৯২৪ সালে প্রকাশিত)
৫) Civilization and Society (১৯৩২ সালে প্রকাশিত)

গিডিংসের তত্ত্ব :—

"মূল সামাজিক ঘটনা কিংবা অবস্থা" কি কি—এই জিজ্ঞাসা নিয়েই গিডিংসের যাত্রা শুরু। অপরাপর সমাজতাত্ত্বিকগণ হয়ত

সংঘাত, চুক্তি, অনুকরণ, বাহ্যিক শক্তি কিংবা ব্যক্তি ইত্যাদি অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হবেন। কিন্তু গিডিংস বললেন 'চেতনার' কথা। তাঁর কথায় সমাজতত্ত্ব হল এমন এক বিজ্ঞান যা সমাজকে তার ঐক্য এবং সংহতির মধ্যে বিচার করতে সাহায্য করে এবং কিছু চেতনা সম্পন্ন ঘটনা কিংবা উদ্দেশ্যের মাধ্যমে পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়।"……এই ধরনের ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রয়োজন প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে আত্মিক অবস্থার পর্যালোচনা। উপরোক্ত দুই ধরণের পর্যালোচনা সবসময়ই সুসংবদ্ধ হওয়া উচিত।" গিডিংসের আর একটি উদ্ধৃতিও তার মানবচেতনা সম্পর্কিত জাতিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে—"সমাজ কিংবা সংগঠনের চেয়ে চুক্তি এবং সন্ধি সম্পর্কিত ঘটনার বিশেষত্ব অনেক বেশী এবং অনুকরণ ও ধারণা হল সাধারণ অবস্থা কিংবা ঘটনা। মানসিক ঘটনা, উদ্দেশ্য এবং সমাজের নিয়ম হল মাধ্যমিক ঘটনা"। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও একই নিয়ম মেনে চলে অর্থাৎ সমাজের মূল এবং প্রধান আত্মিক ঘটনা হচ্ছে "প্রজাতির চেতনা।"

"প্রজাতির চেতনা" যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এর মাধ্যমেই একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। এর মাধ্যমেই জীব এবং জড় পদার্থের পার্থক্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। মানব জীবনে এই চেতনার মাধ্যমেই সামাজিক চরিত্র, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা নির্ণয়ের মূলে রয়েছে প্রজাতির চেতনা।

সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে তিনি যে তত্ত্বের পর্যালোচনা করেন তা নিম্নলিখিত সূত্র মেনে চলে : (ক) সৃষ্টির আদিতে যে সামাজিক সমষ্টি-বদ্ধতার এক প্রভাব পরিলক্ষিত হত তা মূলতঃ বাহ্যিক অবস্থারই যথা খাদ্য সরবরাহ, তাপ প্রভৃতিরই ফলশ্রুতি। স্বভাবতই সমাজকে তখন এক সমসত্ত্ব একক বলে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হ'ত এবং পদ্ধতি ছিল মূলতঃ প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ভর। তখন এই গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে

ঘটল বস্তুগত চেতনার উন্মেষ এবং তারই পরিণতি হল প্রতিষ্ঠান কিংবা সংঘ। ক্রমে ক্রমে এই চেতনার উপর আশ্রয় করে সৃষ্টি হল সামাজিক বিচার বোধ, পছন্দ অপছন্দ এবং ইচ্ছা অনিচ্ছাজনিত এক মূল্যবোধ। এই সূত্রে সমাজতাত্ত্বিকের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করলেন, "প্রথমতঃ সমাজতাত্ত্বিকের দায়িত্ব হল গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং জনসম্মেলনের পেছনের উপাদানগুলিকে আবিষ্কার করা। দ্বিতীয়তঃ সে চেষ্টা করবে সেই নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে যা পছন্দ-অপছন্দজনিত বোধকে পরিচালিত করে এবং সেই নিয়ম নিশ্চয়ই বস্তুগত পদ্ধতিরই অঙ্গীভূত। তৃতীয়তঃ সে সেই নিয়মকেই প্রতিফলিত করবে যা প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং পছন্দ-অপছন্দজনিত বোধের অস্তিত্বকে পরিচালিত করবে এবং সেই নিয়ম নিশ্চয়ই বাহ্য বস্তুগত পদ্ধতিরই অঙ্গীভূত।"

আধুনিক সমাজ হল কিছু সামাজিক চাপেরই ফলশ্রুতি যার মাধ্যম হল সংঘাত এবং প্রতিযোগিতা যা মানুষকে সংস্থা গঠন করতে বাধ্য করেছে। এই সূত্রে গিডিংস মনে করতেন যে উপরোক্ত অবস্থা নির্ভর করে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর। স্পেনসারের তত্ত্বকে তিনি অগ্রাহ্য করে বললেন, "সমাজ, জৈবিক অবস্থার চাইতেও আরও কিছু......সমাজ হল এক প্রতিষ্ঠান যার কিছুটা হল অচেতন বিবর্তনের ফলশ্রুতি এবং কিছুটা হল চেতনা সম্পন্ন পরিকল্পনার ফলশ্রুতি।" তার মতে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে চেতনাসম্পন্ন জীবনের অগ্রগতির এবং মানবজীবনের ব্যক্তিত্ব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের এই চেতনাসম্পন্ন সম্পর্ক থেকে নৈতিক চরিত্রের উন্মেষ ঘটে। এই প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সমাজতত্ত্বের জগতে গিডিংসের বিবর্তনবাদ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

——::——

ফার্দিনান্দ.টয়েনিজ (Ferdinand Tonnies)

(১৮৫৫-১৯৩৬)

প্রস্তাবনা

ছ্যুরখ্যাইম্ এবং হ্বেবারের সময়কালে আর যে সব সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ও চিন্তাধারার মাধ্যমে সমাজতত্ত্বকে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন টয়েনিজ, জর্জ সিমেল, আলফ্রেড ভিয়ারখন্দ্ এবং লিওপোল্ড ফন্ ভিজে প্রমুখ। হ্বেবারের মত টয়েনিজও তথ্য ও ঘটনা নির্ভর গবেষণার ধারা অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন "লৌকিক কিংবা রীতিসিদ্ধ সমাজতত্ত্বের এক প্রবক্তা এবং এই সূত্রে তিনি বলেন যে সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক সম্পর্ক" সম্পর্কিত এবং সামাজিক সম্পর্কের এক পার্থক্য নিরূপণ করার বিজ্ঞান—যেমন নিবিড় এক পারিবারিক সম্পর্ক এবং ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্কের কথা পার্থক্যজনিত আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী ঃ—

টয়েনিজ ১৮৫৫ সালে উত্তর জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিটলারী আমলের আগ পর্যন্ত তিনি কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করতেন। টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পান। ১৯৩৬ সালে টয়েনিজ মারা যান।

১। Gemeinschaft and gesellschaft, ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ লুমিস্ কর্তৃক "Fundamental concepts of sociology" এবং পরে "Community and Association" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

২। "Thomas Hobbs Leben Und Lehre," ১৮৯৬ সালে

প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ 'The Elements of Law: Natural and political' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৩। Die sitte, ১৯০৯ সালে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ বরেনষ্টীন কর্তৃক "Custom: An Essay on Social Codes" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৪। Marx: Leben and Lehre ১৯২১ সালে প্রকাশিত।

৫। Soziologische Studiess Und kritiken (Sociological Studies and Critiques), ১৯২৫ সালে প্রকাশিত।

৬। Einfuhrung in die soziologie (Introduction to sociology), ১৯৩১ সালে প্রকাশিত।

টয়েনিজের অবদান :—

টয়েনিজ ছিলেন মূলতঃ তাত্ত্বিক এক সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর "Community and Association" গ্রন্থে সামাজিক সম্পর্ককে তিনি যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দুই ধরনের (অর্থাৎ সম্প্রদায় সম্পর্কিত সম্পর্ক এবং সমিতি সম্পর্কিত সম্পর্ক) সম্পর্কের মধ্যে যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সেই তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। এই ধরনের আলোচনায় তিনি অনেকটা মেইন্ প্রবর্ত্তিত "মর্যাদা ও চুক্তি" সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি মানবজাতির ইচ্ছার উপর ভিত্তি স্থাপন করে দুই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে তুলনামূলক এক বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সূত্রে তিনি বলতে চেয়েছেন যে আধুনিক যুগে মানুষ তার আত্মস্বার্থ সবসময়ই যুক্তি ও চেতনার পথে পরিচালিত করে। সমাজ কিংবা সংস্থার সঙ্গে তিনি ইচ্ছাকৃত পছন্দ এবং সেইমত যোজনার এক সমন্বয় ঘটিয়েছেন অর্থাৎ যেখানে এক বিশেষ ধরনের ইচ্ছার উপর সম্পর্কের ভিত্ তৈরী হয় এবং সম্প্রদায় সম্পর্কিত সম্পর্ক আলোচনাকালে তিনি ঐতিহ্যপূর্ণ এক ধরনের

আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে একে অপরের consensus অনুযায়ী আচরণ করে। এক কথায় বলা হয় স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছা, যুক্তি ও চেতনাভিত্তিক ইচ্ছার ওপরই দাড়িয়ে থাকে সম্প্রদায় এবং সমিতির সম্পর্কজনিত অবস্থা। পরিবার এবং বিবাহজনিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের সম্পর্কের উদ্ভব হয় তা হল 'Inclusive' অর্থাৎ সেখানে মানুষ পারস্পরিক এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং যেখানে সকলে একত্রে ভাগ্যকে মেনে নেয়—তা সৌভাগ্যই হোক কিংবা দুর্ভাগ্যই হোক এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় সম্প্রদায় সম্পর্কিত সম্পর্ক।

অপর পক্ষে সমিতি সম্পর্কিত সম্পর্ক হল এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপিত হয় যেমন কোন সংস্থার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্কে চুক্তির গুরুত্ব অনেক বেশী এবং দায়দায়িত্ব কিংবা বাধ্যকতার প্রভাব সম্প্রদায় সম্পর্কিত সম্পর্কের চাইতে অনেক কম। টয়েনিজের এই তত্ত্ব সমাজ উন্নয়ন বিশ্লেণের পক্ষেও অপরিহার্য্য। একথা অনস্বীকার্য্য যে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমিতি ভিত্তিক সম্পর্ক তার শিকড় বিস্তার করতে থাকে অর্থাৎ সম্প্রদায় সম্পর্কিত সম্পর্ক অবলুপ্তির পথে পা বাড়ায়—যেমন গ্রামীন সভ্যতার বিলোপ। অবশ্য এই ঐতিহাসিক মতবাদ প্রবর্ত্তন টয়েনিজের মূল লক্ষ্য ছিল না। যদিও তাঁর তত্ত্ব সমাজতাত্ত্বিকদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিল তবুও তাঁর বিশ্লেষণে কিছু ত্রুটী ছিল। দুই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে তিনি যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন তা তুলনায় তত স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ছিলনা। কারণ তিনি সম্প্রদায়গত সম্পর্ক সমাজতাত্ত্বিক পর্য্যায়ে পড়বে না মনস্তাত্ত্বিক পর্য্যায়ের আওতায় পড়বে সে সম্পর্কে সুসংহত কোন ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হননি। একসময়ে তিনি সম্পর্ককে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছিলেন কারণ এই জাতীয় সম্পর্ক আলোচনাকালে তিনি মূলতঃ বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের ভাবপ্রবণতার উপরও যথেষ্ট

গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। হারম্যান সক্লেমেনব্যাক (১৯২২) এই সূত্রে বলেছেন যে সম্প্রদায়গত সম্পর্ক কখনই ভাবালুতাজনিত চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠেনা যদিও এর অভিব্যক্তি ভাবপ্রবনতার মতই। তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবার নিমিত্তে তিনি "কম্যুনিয়ন" ধারণাটি প্রবর্ত্তন করেন যার অর্থ তিনি বিশ্লেষণ করেন এইভাবে যে কম্যুনিয়ন বলতে বোঝায় সেই ধরনের সম্পর্ক যা পারস্পরিক সমঝোতার উপর নির্ভরশীল।

টয়েনিজের সমাজচিন্তাধারা মূলতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ রাজনৈতিক তত্ত্ববিশারদ টমাস হব্‌সের চিন্তাধারার আংশিক প্রতিফলন। হব্‌সের সামাজিক ধারা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত বিশ্লেষণই টয়েনিজকে তত্ত্বগত সমাজবিজ্ঞান আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। হব্‌সের গবেষণা (অর্থাৎ কি করে মানবসমাজের ধারা অব্যাহত থাকে) টয়েনিজকেও যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাঁরও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য। এই ধারণা থেকেই তিনি সম্পর্কের নমুনা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেন যা নির্ভর করে ইচ্ছার প্রকৃতি এবং সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর এবং যা মানুষকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাঁর গবেষণা মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল মানবজাতির ইচ্ছার প্রকৃতি এবং বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের মধ্যে যেখানে সামাজিক আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। মূলতঃ তাঁর তত্ত্ব প্রথা, লোকনীতি, প্রচলিত রীতি, নৈতিক অবস্থা, ধর্ম ইত্যাদি ধারণাকে সম্প্রদায়গত সম্পর্কের আওতায় ফেলেছে। অপরপক্ষে তাঁর তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে আইন এবং জনমতকে সমিতিগত সম্পর্কের আওতায় ফেলা যায়। অবশ্য লোকনীতি হল "আদর্শ আইনের" অন্তর্ভূক্ত এবং সেই কারণে দুই ধরনের ধারণার মধ্যেও তাঁকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এইভাবে টয়েনিজ তাঁর সম্পর্কজনিত তত্ত্বের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। টয়েনিজ

প্রবর্ত্তিত দুই ধরণের সমাজের পার্থক্যজনিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল :

সম্প্রদায়	সমিতি
১। সমষ্টিগত ইচ্ছা	১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইচ্ছা।
২। সদস্যদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার অভিব্যক্তির কম সুযোগ	২। ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রাধান্য অনেক বেশী।
৩। সম্প্রদায়জনিত স্বার্থের পরিব্যাপ্তি অনেক বেশী।	৩। ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিব্যাপ্তি অনেক বেশী।
৪। বিশ্বাসের প্রাধান্য অনেক বেশী।	৪। প্রচলিত নীতির প্রাধান্য বেশী
৫। ধর্মের প্রতি আস্থা অনেক বেশী।	৫। জনমতের গুরুত্ব অনেক বেশী।
৬। প্রচলিত রীতি ও সামাজিক রীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।	৬। ফ্যাসন, শখ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৭। স্বতঃস্ফূর্ত সংহতির ব্যাপ্তি	৭। চুক্তিজনিত এবং আত্ম-কেন্দ্রিক সংহতি।
৮। সমষ্টিগত মালিকানা	৮। ব্যক্তিগত মালিকানা।

টয়েনিজের মতে উপোরক্ত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সম্প্রদায় সমাজের আওতায় গিয়ে পড়ে এবং এইভাবে মানুষের কৃষ্টি সভ্যতায় পরিণত হয়।

—o—

জর্জ সিমেল ঃ—(George Simmel)

(১৮৫৮-১৯১৮)

জর্জ সিমেল ১৮৫৮ সালে বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদী। ১৮৭৬ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮১ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি ষ্ট্রসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে "Ordinarious" অধ্যাপকের পদ লাভ করে সম্মানিত হন। তাঁর সেমেটিক বিরোধী মনোভাবই ছিল তাঁর পদোন্নোতির দেরীর কারণ। ১৯১৮ সালে তিনি মারা যান। তবে সিমেলের সমাজ সম্পর্কজনিত গবেষণা এবং বক্তৃতাই তাঁকে সমাজ-তত্ত্বের জগতে খ্যাতির মুকুট পড়িয়েছে। যদিও তিনি দর্শন, অর্থনীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তবু সমাজ-তত্ত্বের জগতেই তাঁর স্বীকৃতি অনেক বেশী এবং তিনি এক সমাজ-তাত্ত্বিক হিসাবেই পরিচিত। তাঁর লেখা সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ঃ—

১। Die Probleme der Geschichte Philosophie ১৮৯২ সালে প্রকাশিত।

২। Exkurs Uber das Problem : Wieist gesellschaft moglich ? মূল নিবন্ধ এ. ডব্লু স্মল্ কর্তৃক "How is Society Possible" নামে "আমেরিকান জার্ণাল অব সোসিওলোজিতে" ১৯১০ সালে প্রকাশিত।

৩। 'Philosophie des geldes' (Philosophy of Money) ১৯০০ সালে প্রকাশিত।

৪। 'Die grossstadte Und das Geistesleben", ১৯০২ সালে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ কে. এইচ, উলফ্ কর্তৃক "The Metropolis and Mental life' নামে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত।

৫। Kant ১৯০৪ সালে প্রকাশিত।

৬। Soziologie ১৯০৮ সালে প্রকাশিত।

৭। Hauptprobleme der Philosophie ('Chief problem of Philosophy') ১৯১০ সালে প্রকাশিত।

৮। Philosophische Kultur : Gesammelte Essais ("Social Philosophy of Culture : Collected Essays") ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

৯। Grundfragen der soziologie ("Fundamantal Problems of Sociology") ১৯১৭ সালে প্রকাশিত।

১০। "Der Streit," মূল গ্রন্থ এ. এফ বরেণষ্টিন কর্তৃক "Custom : An Essay on Social codes" নামে এবং 'Soziologie' এর চতুর্থ অধ্যায় কে, এইচ উলফ্ এবং রুথ বেনডিক্স কর্তৃক "Conflit" এবং "The Web of group affiliations" নামে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত।

১১। Soziologie der geselligKeit, মূল গ্রন্থ "The Sociology of Sociability" নামে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত।

সিমেলের তত্ত্ব ঃ—

সিমেল তাঁর আলোচনার সুবিধার্থে সমাজতত্ত্বকে তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করেছেন ঃ ক) সাধারণ সমাজতত্ত্ব "যা একই ধরণের সামাজিক বিষয়বস্তুর কথা আলোচনা করে"। সিমেলের কথায়, "এই ধরণের সমাজতত্ত্ব মানবজাতির অস্তিত্বের কথাই ঘোষণা করে" এবং এই ধরণের সমাজতত্ত্ব সবসময়ই সামাজিক ঘটনা এবং সমস্যাকে

সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ক'রে উন্নয়নের মাপকাঠিতে বিচার করে। খ) "দর্শনভিত্তিক সমাজতত্ত্ব" যার মাধ্যমে আধিবিদ্যক এবং জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের দর্শন এবং পদ্ধতি আলোচনা হল দর্শনভিত্তিক সমাজতত্ত্বের মূল লক্ষ্য। গ) "রীতিসিদ্ধ সমাজতত্ত্ব" যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সিমেলের নাম এবং যে সমাজতত্ত্বকে তিনি সমাজের প্রতিমূর্তি (বাহ্যিক) হিসাবে ধরে নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

সিমেলের মতে সমাজ হল মানবজাতির সম্পর্কের এক ফলশ্রুতি। এই সম্পর্কের বিভিন্ন বিন্যাস কিংবা গঠন বৈশিষ্ট্য আলোচনাই হল রীতিসিদ্ধ কিংবা লৌকিক সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। সিমেলের ভাষায় লৌকিক সমাজতত্ত্ব ব্যাকরণের সূত্র ধরে এগোতে থাকে এবং "contents" থেকে আদর্শবিন্যাস কিংবা গঠন বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলাদাকরে নেয়। এই গঠন বৈশিষ্ট্যগুলোই অতঃপর মানবজীবনের পরিপূরক হিসাবে সূচিত হয়।"......আমরা বাহ্যদিক থেকে রাষ্ট্রের মধ্যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, চক্রান্তকারীর কোন গোষ্ঠীর মধ্যে, অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে, বিদ্যালয়ে কিংবা পরিবারে সবসময়ই প্রভূত্ব ও দাসত্ব, প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাজন, দলগঠন, বিক্ষোভ প্রদর্শন কিংবা আভ্যন্তরিক সংহতি দেখতে পাই। যদিও স্বার্থের অভিব্যক্তি বিভিন্ন তবুও এই ধরণের অভিব্যক্তি সামাজিক গঠন বৈশিষ্ট্যের কথাই সূচিত করে........"। সিমেলের মতে সমাজ শুধুমাত্র মানুষেরই সমষ্টি নয় কিংবা কোন আধিবিদ্যক ঘটনাই নয়-সমাজ হল মানুষ এবং তার পারস্পরিক সম্পর্কের এক সম্মিলিত প্রয়াস। এই সূত্রে সিমেল বললেন যে আমাদের উচিত সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে নিষ্কাসিত করে নিয়ে আসা (যেমন প্রতিযোগিতা এবং দাসত্ব) যা বিভিন্ন ঘটনা কিংবা অবস্থার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সিমেলের চিন্তাধারা সেই ধরণের "গঠন বৈশিষ্ট্য" কিংবা বিন্যাসকে অনুসন্ধান করার বাসনা নিয়েই গড়ে উঠেছে।

প্রতিযোগিতাকে তিনি সংঘাতের এক রূপ হিসাবেই মনে করেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে "সামাজিক গঠনের" কথাই আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের গঠন আলোচনাকালে দুইজন এবং তিনজন সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠীর উদাহরণ তুলে ধরেন যাকে বলা হয় "দ্বি-সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠী এবং ত্রি-সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠী।"

দ্বি-সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠীর আলোচনাকালে তিনি বলেন যে দুজনের মধ্যে যেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়ার নিবিড়তা এবং আন্তরিকতা থাকে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি যদি সেই সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে তবে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সিমেল বলেন, দুজনের মধ্যে যে পারস্পরিক সমঝোতা থাকে সেখানে তৃতীয় কিংবা আরো অনেক ব্যাক্তি যদি প্রবেশ করে তবে নিশ্চয়ই মূল গোষ্ঠীর চরিত্র বদলায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক সন্তানসহ দম্পতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানহীন দম্পতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেক আলাদা। আবার এদের তুলনায় অনেক সন্তানসহ দম্পতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশী আলাদা। সিমেলের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা অনেকাংশেই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং সেই কারণে তিনি তাঁর নিজের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি এমন কোন প্রকল্প বিধিবদ্ধ করতে পারেননি যা প্রমাণ করা যেতে পারে যদিও তাঁর অনুমান যে কোন প্রকল্পকেই প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। তিনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-গত অবস্থার মধ্যে এক অদ্ভুত সমতা এবং মিল যেভাবে উপস্থাপিত করতেন ধারণার জগতে সত্যিই তা বিরল। সুসংহত সমাজতত্ত্বের যদিও তিনি প্রবক্তা ছিলেন না তবুও সমাজতত্ত্বের দুরুহ এবং জটিল প্রশ্নগুলোকেই তিনি পর্যালোচনা করে সমাজতত্ত্বের জগতে অমর হয়ে রয়েছেন।

যদিও সিমেল সামাজিক গঠন বৈশিষ্ট্য কিংবা বিন্যাসের ওপরই

গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অনেক বেশী তবুও তিনি সামাজিক অবস্থার (social situation) 'content' আলোচনাকে তার গবেষণার আওতায় এনেছিলেন। নগরসমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং শহরের মানুষের মনস্তত্ত্ব তিনি তাঁর "Metropolis and Mental life" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। উপরোক্ত তত্ত্ব আলোচনাকালে তিনি বলেছেন যে শহর, মানুষকে এক বিশেষ ধরণের সচেতনতার জন্ম দিয়ে গ্রামীন জীবন থেকে আলাদা করে নিতে বাধ্য করে। যেহেতু শহর হল অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র সেইহেতু অর্থের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মানুষের গুনগত চরিত্র পরিমাণবাচক চরিত্রে পরিণত হয়। ডুারখ্যাইমের মত সিমেলও শহরকে শ্রমবিভাজনের ফলশ্রুতি হিসাবে পরিগণিত করেছিলেন। শহর সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনাকালে তিনি বলেন, "শহর হল এমন এক স্থান যেখানে মুক্তি এবং সমতার মন্ত্র উচ্চারিত হয়। আবার এই শহরেই মানুষ নিজের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। এই "Arena"তে আবার সংঘাতও ঘটে। এইভাবেই শহর এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে পরিচিত হয় যে শহর সর্বদাই সম্ভাবনাকে গর্ভে ধারন করে থাকে"। সিমেলের মতে, সমাজতত্ত্ব কখনোই বিশ্বকোষ হিসাবে মনে করা ঠিক নয় বরঞ্চ সমাজতত্ত্বের পরিধির এক গণ্ডী কেটে দেওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি সমাজতত্ত্বকে সম্পর্ক-বিন্যাসজনিত এক বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর "Philosophy of History" গ্রন্থে তিনি ব্যক্তিসত্তাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশী এবং তাঁর মতে সংঘাত এবং পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমেই মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেখানেই আসে সমাজের বাস্তবতা। এইসূত্রে তিনি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন যে একমাত্র ব্যক্তিত্বই হল মানুষের চারিত্রিক অভিব্যক্তির একমাত্র লক্ষণ এবং সিমেলের মতে "সামাজিকতা" উদ্ভুত হয় উপরোক্ত ধর্মের উপর নির্ভর করে। সিমেলের চিন্তাধারার অনুসরনে এলবিত্তন স্মল এবং রস্ সমাজতত্ত্বের জগতে প্রভূত পরিমাণে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber)

(১৮৬৪-১৯২০)

প্রস্তাবনা :—

এমিল হ্যুরখ্যাইম্ সমাজতত্ত্বকে তুলনামূলক চিন্তাধারার আওতায় ফেলে বিশ্লেষণ করেছিলেন। উপরোক্ত তত্ত্ব পর্যালোচনা কালে তিনি কিছু সামাজিক প্রজাতি বা 'type' এর কথার উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে পরিষ্কার কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং সম্ভবতঃ এটাই হোল হ্যুরখ্যাইমের চিন্তা-ধারার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তবে সর্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হ্বেবারই প্রথম যিনি হ্যুরখ্যাইমের অসম্পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ মতবাদকে এক স্বচ্ছ গঠনমূলক রূপ দেন। হ্যুরখ্যাইমের মূল উদ্দেশ্য ছিল "সামাজিক গঠনের" বিশ্লেষণ করা, কিন্তু হ্বেবারের মূল লক্ষ্য ছিল "সামাজিক পদ্ধতির" বিশ্লেষণ করা। যদিও হ্যুরথাইম্ ও হ্বেবার ভিন্ন মতের এবং ভিন্ন পরিবেশের লোক ছিলেন তবুও তাঁদের চিন্তাধারায় কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা উভয়েই "পদ্ধতি সম্পর্কিয় সমস্যা" নিয়ে আলোচনা করেছেন, ধর্মীয় বিশ্লেষণের আলোকে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, উভয়েই নিজেদের দেশের ভাগ্যের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী :—

ম্যাক্স হ্বেবার ১৮৬৪ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবি যিনি "প্রুসিয়ান ডায়েট এবং রাইখ্ষ্টাগের ন্যাশনাল লিবারেল"-এর সভ্য ছিলেন। বার্লিনে থাকাকালীন হ্বেবার বহু গুণীজন, পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন আইন ও অর্থনীতির

ছাত্র। পরে তিনি সমাজতত্ত্ব নিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রফেসার হন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা "Archiv fur Sozialwissenschaft Und Sozialpolitic"-এর যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। বহু বছর রোগ ভোগের পর ১৯২০ সালে তিনি মারা যান। মাত্র ৫৬ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এত স্বল্প-কালের মধ্যে সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্য নির্ভর গবেষণা উজ্জ্বল ভাস্বরের মত আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :—

Gesammelte Aufsatze zur Religion Soziologie (১৯২০-১৯২১ সালের মধ্যে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত)। মূল গ্রন্থ বিভিন্ন খণ্ডে গার্থ ও মার্টিনডেল কর্তৃক "Ancient Judaism" গার্থ কর্তৃক "The Religion of China" এবং "The Religion of India" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

২) Gesammelte Aufsatze zur wissenschaftslehre, ১৯২২ সালে প্রকাশিত। মূলগ্রন্থ এডওয়ার্ড শীল্‌স্‌ এবং হেনরি ফিঞ্চ কর্তৃক "The Methodology of the social sciences" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৩) Wirtschaft Und Gesellschaft, ১৯২২ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থের কিছু অংশ মার্টিনডেল এবং নিউওয়ার্থ কর্তৃক "The city," হ্যাণ্ডারসন এবং ট্যালকট পারসনস্‌ কর্তৃক "The Theory of Social and Economic Organization" এবং মার্টিনডেল, রিডেল ও নিউওয়ার্থ কর্তৃক "The Rational and Social Foundations of Music" নামে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত।

৪) Wirtschaftsgeschichte, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত। মূল

গ্রন্থ ফ্র্যাঙ্ক নাইট্ কর্তৃক 'General Economic History' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৫) Gesammelte Aufsatze zur Soziologie und sozialpolitik (collected works in sociology and social politics) ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

৬) GAZW, GPS এবং WUG গ্রন্থের কিছু অংশ "The Protestant Ethic and the spirit of capitalism" নামে ১৯৩০ সালে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত।

জার্মানীতে বুদ্ধিজীবিরা প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনার মাধ্যমেই বিখ্যাত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ নেঁবুর, লিউপোল্ড ফন্ র‍্যাঙ্কে, থিওডর মোমসেন্ প্রভৃতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম করা যেতে পারে। শুধু ইতিহাসই নয়—অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানেও যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন অটো ফন্ গিরকি, উইলহেলম্ রস্চার, কার্ল নীজ প্রমুখ। তবে যিনি পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন সেই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস্ জার্মানীরই লোক। জার্মান ঐতিহাসিকের বিভিন্ন লেখায় এবং চিন্তাধারায় মার্কসের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। এর মূল কারণ সম্ভবতঃ জার্মান সোস্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে ব্রিটীশ লেবার পার্টির বিরোধ। ম্যাক্স হ্বেবার যদিও সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তথাপি মার্কসের আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ বিশ্লেষণ তত্ত্ব তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। কারণ তিনি পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ বিশ্লেষণের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

তুলনামূলক পদ্ধতি ও আদর্শভিত্তিক নমুনাতত্ত্ব :—

হ্বেবার বিশ্বাস করতেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করা কিংবা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই ধারণার

অস্পষ্টতা দূর করবার জন্য তিনি সামাজিক বিষয়কে কিছু নমুনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে চাইলেন। তিনি মনে করতেন যে কোন নমুনাকে যদি ঠিকমত বিশ্লেষণ করা যায় এবং নমুনাগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকে তা হলে নমুনাগুলিকে সামনে রেখে যে কোন সামাজিক ঘটনাকেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই সূত্রে তিনি "আদর্শ নমুনা" কথাটির উল্লেখ করলেন। আসলে তিনি চেয়েছিলেন তথ্যের জটিলতা এবং স্তূপের মধ্য থেকে সামাজিক ঘটনাকে নির্ব্বাচিত করতে যার বাস্তবভিত্তি হবে দৃঢ় এবং সুসংহত। অবশ্য তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্বকে একেবারেই তুচ্ছ করেন নি। ক্রিয়াকে তিনি এক সামাজিক ধারণা বলে উল্লেখ করেন। কোন দোকান থেকে কোন কিছু ক্রয় করা কিংবা শিশুর সাথে খেলা করার ঘটনাকে যদি নমুনা হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে ক্রিয়া থেকে আচরণজনিত ধারণায় পৌঁছানো যায়। এক কথায় বলা যায় নমুনা থেকে আসে ক্রিয়া—ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত হয় আচরণ এবং আচরণ থেকে উদ্ভুত হয় বাস্তবতা। সমাজের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করা যায়। ম্যাক্স হ্বেবার 'আদর্শ নমুনা' সম্পর্কিত ধারণাকে "উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সম্ভাবনাময় এক ক্রিয়া" হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন "আদর্শ নমুনা সম্পর্কিত ধারণা" আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতাবৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। "এই ধারণা সিদ্ধান্ত কিংবা তত্ত্ব নয় কিন্তু সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব গঠন করতে সাহায্য করবে, এই ধারণা বাস্তবতার বিবরণ নয় কিন্তু কোন বিবরণের অস্পষ্টতা দূর করবে……।" তাহলে দেখা যাচ্ছে হ্বেবার "যুক্তি সম্পন্ন ক্রিয়া" সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ আদর্শ নমুনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

পুঁজিবাদ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ঃ—

পুঁজিবাদ সম্পর্কে প্রথমেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে ঃ (১) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং (২) ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা। এই দুটি প্রশ্ন আলোচনকালে হেবার ইতিহাসের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের এক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। হেবারের মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা। ধনতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং ধনতন্ত্রের প্রকৃতিও বিভিন্ন (ভেনেটাইন প্রজাতন্ত্রের ধনতান্ত্রিক অবস্থা, অ্যান্তওয়ার্প-এর ধনতন্ত্র, এলিজাবেথের সমন্বকালের ইংলণ্ড ইত্যাদি)। হেবার মনে করতেন যে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা, আলোচনার বিষয়বস্তু হয় তবে এমন এক ক্ষেত্র থাকবে যার ওপর ভিত্তি করে আর একটি সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। অর্থাৎ হেবারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষেত্রকে জানা যা নির্ভর করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর। হেবার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (Economy and Society) ছয় রকমের ধনতান্ত্রিক নমুনার কথা উল্লেখ করেছেন।

আইন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত চেতনা :—

আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের পরিষ্কার বিশ্লেষণ তখনই সম্ভব হয় যখন ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ইংলণ্ড কিংবা ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার এক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হেবার এইসূত্রে আইন ও শাসনব্যবস্থার কিছু নমুনার উল্লেখ করেছেন। শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণকালে তিনি "কর্তৃত্ব" কথাটির ওপর আলোকপাত করেন। কর্তৃত্বের অর্থ হচ্ছে আইনসিদ্ধ ক্ষমতা। যে কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা যায় একদল লোক (কিংবা একজন) আদেশ করে এবং অপরে সে আদেশ পালন করে। যারা আদেশ দেয় এবং আদেশ পালন করে সেই উভয় দলই কর্তৃত্বের এই পদ্ধতিকে মেনে চলে। এক কথায় বলা যায় আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা যখনই আইনসিদ্ধ হয় তখনই এই ধরণের সূত্র প্রযোজ্য। হেবার এই প্রসঙ্গে তিন ধরণের কর্তৃত্বের নমুনা উপস্থাপিত করেন যথা :—ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব, যুক্তি নির্ভর এবং আইনসিদ্ধ কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব নির্ভর কর্তৃত্ব।

ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব :—

যখন লোকে কোন উর্দ্ধতন ব্যক্তির আদেশ পালন করে এই ভেবে যে এক স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা এই ভাবেই চলে আসছে যা মানতেই হবে—সেই ধরনের কর্তৃত্বকে বলা হয় ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব। মধ্যযুগের সমাজে এই ধরনের কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তিনির্ভর এবং আইন সিদ্ধ কর্তৃত্ব :—

যখন লোকে কোন আদেশ পালন করে এই ভেবে যে আদেশ, নিয়ম ও আইন দ্বারা সিদ্ধ এবং সেই কারণে যুক্তি নির্ভর তখন সেই ধরনের কর্তৃত্বকে বলা হয় যুক্তি নির্ভর এবং আইন সিদ্ধ কর্তৃত্ব। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের 'আমলাতন্ত্র' এই ধরনের কর্তৃত্বকে উপস্থাপিত করে।

ব্যক্তিত্বনির্ভর কর্তৃত্ব :—

যখন লোকে কারও আদেশ পালন ক'রে আদর্শকারীর ব্যক্তিত্বের কাছে নতি স্বীকার করে তখন সে ধরনের কর্তৃত্বকে বলা হয় ব্যক্তিত্ব নির্ভর কর্তৃত্ব। ১৯১৭ সালের পরের রাশিয়া এবং নাজী জার্মানীতে এই ধরনের কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়।

হ্বেবার উপরোক্ত তত্ত্ব আলোচনাকালে বলেন যে আধুনিক সংগঠনের দৃঢ়তা এবং সুষ্ঠ কার্যনীতির জন্য আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রয়োজন অনেক বেশী। ব্যক্তিত্ব নির্ভর কর্তৃত্বে সুসংহত শ্রম-বিভাজন এবং স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহ্যপূর্ণ কর্তৃত্বে শাসনব্যবস্থার ভঙ্গুরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বে আইনের প্রভাব অনেক বেশী বলে আধুনিক সংগঠনকে সুদৃঢ় এবং সুসংহত করে গড়ে তোলে। হ্বেবার তাঁর "The Theory of Social and Economic Organisation" গ্রন্থে আমলাতন্ত্রের কয়েকটি গঠন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন :

১) সংগঠনের কার্যকারিতা "নিয়মের দ্বারা পরিচালিত"।

২) দক্ষতা প্রাধান্য লাভ করবে। "দক্ষতা বলতে বোঝায় (১) কাজ করবার বাধ্যবাধকতা যা শ্রমবিভাজনের একটি অঙ্গ; (২) কাজ করবার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ; (৩) বাধ্যবাধকতার সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় এবং অবস্থার সঙ্গে ব্যবহারের সমন্বয় সাধন"।

৩) সংগঠন সবসময়ই স্তরবিন্যাসের সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ অধস্তন বিভাগ উর্দ্ধতন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে এবং তদারকীতে থাকবে। এতে কোন বিভাগই অনিয়ন্ত্রিত থাকবে না।

৪) যে নিয়মদ্বারা সংগঠন পরিচালিত হবে তা প্রযুক্তি নির্ভর-নিয়মও হতে পারে......অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তবে তিনি কর্তৃপক্ষের সদস্য হতে পারেন।

৫) কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ সবসময়ই ব্যক্তিগত মালিকানা (সে উৎপন্ন দ্রব্যেরই হোক কিংবা শাসন ক্ষমতারই হোক) থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে।

৬) সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য সংগঠনের সংহতিকে সবসময়ই বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৭) কর্তৃপক্ষের আইন, বিধান, সিদ্ধান্ত এবং নিয়ম লিখিতভাবে দলিলভুক্ত করতে হবে।

যুক্তিযুক্ততা বিশ্লেষণকালে হেবার দুই ধরণের যৌক্তিকতার কথা বলেছেন—যথা—রীতিসিদ্ধ যুক্তি এবং বাস্তব যুক্তি।

আইন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি রীতিসিদ্ধ যুক্তিভিত্তিক আইনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেক বেশী যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। ধনতান্ত্রিক সমাজ অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি নির্ভর অথচ রীতিসিদ্ধ আইনও প্রাধান্য বিস্তার করে। আইন এবং শাসনক্ষমতার যৌক্তিকতার ওপর নির্ভর করেই হেবার আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন এবং

এই যৌক্তিকতা নির্ভর করে কিছু মূল ধারণা ও বিশ্বাসের উপর যা পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হেবারের এই ধারণাকে যুক্তিনির্ভর আইনসিদ্ধ এক বৈধতা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এছাড়াও ধনতন্ত্রের অন্য উপাদান রয়েছে যা হেবার নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছেন। লাভ সংক্রান্ত অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হেবার দেখাতে চেয়েছিলেন, যে কোন জাতীয় উপাদান এবং কর্মধারা পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক গড়নের উপযোগী। এইসূত্রে তিনি "জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি" কিংবা "করপোরেশন" এবং "ষ্টক একসচেঞ্জ মেসিনারীর" কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আর যে সমস্ত উপাদান পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে তা হল বিশেষ কিছু মুদ্রার প্রচলন এবং সেই সেই মুদ্রার বিনিময়ের পথ সুগম করে তোলা। তাছাড়া বিশেষ কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতার উপাদানেরও প্রয়োজন রয়েছে। হেবার তাঁর "The Protestant Ethic and the Spirit of capitalism" গ্রন্থে পুঁজিবাদের উৎপত্তির কথা পর্যালোচনা করেছেন। "Spirit of capitalism" বলতে তিনি কিছু বিশ্বাস ও মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন যার অর্থ হল—"অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে শক্তি নিয়োগ করা ভালো"। এক কথায় বলা যায় যে ধনতন্ত্রের মূল কথা হল সর্ব্বোচ্চ সম্পদ আহরণ করার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত বিশ্বাস যা সংগতির কথা চিন্তা করতে প্রয়াসী হয় না যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সংগতি ফলপ্রসূ হয়। উপরোক্ত মনোভাব ঐতিহ্যগত মনোভাব থেকে নিঃসন্দেহে আলাদা। ধনতন্ত্রের এই যে প্রকৃতি তা মানুষকে তার স্বব্যবহার এবং আচার আচরণ সম্পর্কে সেইমত সচেতন করে তোলে এবং স্বার্থ পুরণের এই গঠন বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে আত্মিক অনুভূতিরই নামান্তর মাত্র। ধনতন্ত্রের প্রকৃতি উন্মেষের স্বপক্ষে বেশ কিছু উপাদান যে রয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। হেবার এই প্রসঙ্গে প্রোটেসট্যান্ট আন্দোলনের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করেন।

প্রোটেসট্যান্ট ধর্ম কিছু ক্রিশ্চিয়ান পণ্যের উপাদান যথা—নিঃস্বার্থ মনোভাব, নম্রতা এবং দানশীলতার জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য সেই ধর্মের মধ্যে এমন কিছু উপাদানও ছিল যা ধনতন্ত্রের প্রকৃতির সহায়ক। প্রথমতঃ কঠোর সংযমের কথাই ধরা যেতে পারে যা ধনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট সাহায্য করে, দ্বিতীয়তঃ সুবিন্যস্ত এবং নিয়মানুবর্তীতার গণ্ডীতে আবদ্ধ জীবনবোধ এবং তদ্রূপ পারস্পরিক সম্পর্কও ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিল। সর্ব্বোপরি বলা যায় যে প্রোটেসট্যান্ট নীতি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রভিত্তিক। হেবার কখনও বলেন নি যে প্রোটেসট্যান্ট ধর্মই ধনতন্ত্রের উন্মেষ ঘটিয়েছে। মার্কসীয় বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের বিরুদ্ধে তিনি কোন আদর্শ ব্যাখ্যারও জন্ম দেন নি। হেবার তাঁর রচনার শেষ অংশে বলেছেন "It is the cause, not my aim to substitute for a one sided materialistic an equally one sided spiritualistic causal interpretation of culture and of history".

তিনি চেয়েছিলেন মানবসমাজের গঠনের সঙ্গে, বিশেষ করে অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মের এক সমন্বয় স্থাপন। তাঁর মতে, কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থনৈতিক কার্যকারিতাকে ত্বরান্বিত করে আবার কিছু বিশ্বাস অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই হেবার ধর্মসংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্রতী হন। এই সূত্রে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের নগর উন্নয়নের রূপরেখা অঙ্কন করতেও সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর "The City" গ্রন্থে বিশ্বের বিভিন্ন রকম নগরের মধ্যে পার্থক্য পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে কি করে গ্রাম সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে নগর সভ্যতার "সম্পর্কের বন্ধন" শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর গ্রন্থে সেই পদ্ধতির কথাও আলোচনা করেছেন যার ওপর নির্ভর করে উত্তর ইউরোপের সম্পর্কজনিত বন্ধন, অর্থনৈতিক সংস্থার অভ্যুত্থান এবং চার্চের

অভ্যুত্থানের ফলে শিথিল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি নগর সভ্যতার উন্নয়নের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে নগর সভ্যতা হল ধর্মনিরপেক্ষ এক সভ্যতা যার নাগরিকেরা খাজনা দেবার বিনিময়ে নাগরিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

হিন্দুধর্ম আলোচনাকালে তিনি কুটীরশিল্পসমাজ ও বণিকশিল্প সমাজের কথা উল্লেখ করেন যা ভারতবর্ষে মুক্তি সম্পর্কিত দর্শন ভিত্তিক ধর্মের অভ্যুত্থানের সময়কালে এবং নগর সভ্যতার ঊষা লগ্নে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। হেবার ভারতবর্ষের গিল্ডের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপের গিল্ডের তুলনা করেছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি জাতিপ্রথার উল্লেখ করেছিলেন যা গিল্ডপ্রথার চাইতে ভারতবর্ষে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল এবং এই জাতিপ্রথার উন্মেষ ঘটে ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। জাতিপ্রথার এই যে প্রকৃতি তা নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় গিল্ড প্রথার চাইতে স্বতন্ত্র্য ছিল।

প্রাক বিপ্লবোত্তর চীনের "কনফুসিয়ানিজমের" কথাও তাঁর গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন। চীনের এই ধর্ম ছিল মূলত: শোষক-শ্রেণী সমর্থিত। এই ধর্মের যারা পৃষ্টপোষক তারাই রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। চীনে যে গিল্ডপ্রথা ছিল সেখানে এই প্রথাভুক্ত সম্প্রদায় কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিল না—গোত্র এবং পরিবারের ওপরই ছিল তার কর্ত্তৃত্ব। যে গোষ্ঠী প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা নিয়ে চীনে আবির্ভূত হয়েছিল তারা হ'ল আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা। যদিও পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশে আমলাতন্ত্র অতখানি সুবিন্যস্ত এবং সুসংহত ছিল না তবুও চীনের আমলাদের তখন কাজ ছিল খাজনা আদায় করা। হেবার এই সূত্রে আবার ধর্ম, অর্থনৈতিক মনোভাব এবং সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে এক সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেন। হেবারের গবেষণার ক্ষেত্র এত

বিস্তৃত ছিল তা এই ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার স্বকীয়তা এবং চিন্তাধারার গভীরতা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে ম্যাক্স হেবার ছাড়া সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে আলাদা করে ভাবা সম্ভব নয়।

———:———

কার্ল ম্যানহাইম্ ঃ— (Karl Mannheim)

(১৮৯৩-১৯৪৭)

কার্ল ম্যানহাইম্ হাঙ্গেরীর অন্তর্গত বুদাপেষ্টে ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বার্লিন, বুদাপেষ্ট, প্যারিস এবং ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করে ১৯২৬ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে "Privatdozent"-এর পদ অলঙ্কৃত করেন। অবশেষে তিনি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি মারা যান। তাঁর গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ঃ

১) Essays on Sociology and Social Psychology (১৯২২ সালে প্রকাশিত)

২) Essays on Sociology of Knowledge (১৯২৫ সালে প্রকাশিত)

৩) Ideology and Utopia : An Introduction to the Sociology of knowledge (১৯২৯-৩১ সালে প্রকাশিত হয়)

৪) Man and Society in an Age of Reconstruction : Studies in Modern Social Structure (১৯৩৫ সালে প্রকাশিত)

৫) Diagnosis of our time : War time Essays of a Sociologist (১৯৩৯-৪৩ সালে প্রকাশিত)

৬) Systematic Sociology

৭) Freedom, Power and Democratic Planning.

৮) Essays on Sociology of Culture.

ম্যানহাইমের তত্ত্ব :

কার্ল ম্যানহাইমের যতখানি না পরিচয় সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে তার চাইতে বেশী পরিচয় তিনি একজন দার্শনিক। তবে তাঁর দর্শন নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে অনেকে এক "বিশেষ প্রগতিবাদী পাশ্চাত্য-বুর্জোয়া" সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা বলে অভিহিত করেন। তাঁর "আদর্শগত চেতনা" সম্বলিত মতবাদকে আজও পাশ্চাত্য দেশে এক পরিণত চিন্তাধারা হিসেবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়। ম্যান্‌হাইম্ তাঁর "আদর্শ" (Ideology) সংক্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেই সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯২৭ সালে লিখিত "The Sociology of Knowledge" এবং ১৯২৯ সালে লিখিত "Ideology and Utopia" গ্রন্থে তিনি প্রথম এক দর্শন নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ গড়ে তোলেন এবং "প্রগতিশীল বুর্জোয়া" চিন্তাধারাকে পাথেয় করে আদর্শের সঙ্গে সমাজের এবং আদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের এক সম্পর্কের কথা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে বিজ্ঞান হ'ল, "objective by virtue of its non-partisanship and impartiability" এবং আদর্শ হ'ল, "being partisan and class biased was always subjective and always distorted genuine knowledge of reality." ম্যানহাইমের "Ideology" সংক্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে মস্কিভিচভের মন্তব্য হ'ল : "In spite of criticism, sometimes harsh, of certain propositions and conclusion in Mannheim's work, his general treatment of ideology is widely accepted. It has served even as a basis for some other fashionable bourgeois theories....".

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক পেলম্‌বারার মতে, আদর্শসংক্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কে বেল্, লিপসেট কিংবা অপরাপর সমাজবিজ্ঞানী যতই মতবাদ গড়ে তুলুন না কেন, প্রত্যেক চিন্তাধারার নেপথ্যে রয়েছে ম্যানহাইম্ প্রবর্ত্তিত তত্ত্বের অনুপ্রেরণা।

ম্যানহাইম্ দুই ধরনের "socially distorted" চিন্তাধারার প্রবক্তা : ক) আদর্শ (Ideology) খ) ইউটোপিয়া। তিনি আবার এই 'ইডিওলোজি'কে দুই ভাগে অর্থাৎ "বিশেষ আদর্শ" (particular ideology) এবং সম্মিলিত কিংবা সাধারণ আদর্শে (total or general ideology) ভাগ করেছেন। তাঁর প্রথম চিন্তাধারা প্রয়োগ করা যায় এমন অবস্থাতে যেখানে "a social group regarded certain ideas and notions of its oponents as distorting reality." সাধারণ আদর্শকে প্রয়োগ করা যায় এমন অবস্থাতে যেখানে "structure of the mind of a social group in its totality or even a whole era, as being distorted." এই সাধারণ আদর্শের শিকড় আবার নিহিত রয়েছে "subjective and psychological" অবস্থার ভেতরে। ম্যানহাইমের মতে আদর্শ, (Ideology) শোষকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে যা "sought to preserve the status quo and consequently a conservative character." এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আদর্শ হ'ল এক 'অবাস্তব' কিংবা, 'অতি-প্রাকৃত' এক প্রত্যয় যা "current order" এর সঙ্গে একেবারেই যুক্ত নয়। ইউটোপিয়া প্রসঙ্গে ম্যানহাইম্ বললেন যে, ইউটোপিয়া হল' "Social theories of opposition and oppressed social groups....which were revolutionary and directed to destroying the status quo." কিন্তু "Utopias too transcend the social situation, for they too orient conduct towards elements which the situation, in so far as it is realised at the time, does not contain." মানবচিন্তার বিয়োগান্তক পটভূমি সম্পর্কে ম্যানহাইম্ 'সামাজিক বাস্তবতাকে'ই দায়ী করলেন যা প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী হয় না (আদর্শগত ধারণা যা ইউটোপিয়ায় পরিণত হয়)। উভয়ক্ষেত্রেই "Reality

would be concealed and distorted." অবশ্য ম্যানহাইমের তত্ত্বে "Nihilism"-এর যে উগ্র ছোঁয়া রয়েছে তা অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী মেনে নিতে পারেন নি। প্রথমতঃ ম্যানহাইম্ "ইডিওলোজি ও ইউটোপিয়া"র যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে তিনি গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর সামাজিক কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন নি যা 'ইডিওলোজি এবং ইউটোপিয়া' মতবাদের মূল প্রেক্ষাপট। তিনি ঐতিহাসিক বিকাশের নেপথ্যে যে আদর্শ কাজ করে তার প্রত্যয়গুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু সেই ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যালোচনা করেন নি—বিশ্লেষণ করেন নি তদানীন্তন সমাজের গড়ন বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং বিকাশের বিন্যাসের কথা। ম্যানহাইমের তত্ত্বের দ্বিতীয় ত্রুটী হ'ল "সত্যতার সমস্যা"। "Relatively objective truth did not exist, as far as Mannheim was concerned. In all his Judgements, he based himself on the idea that only absolute truth could be objective truth. Yet, since no social class or group could possess such a truth, there could not be objective truth at all." (মস্কিভিচভের সমালোচনা)।

ম্যানহাইমের আর যে তত্ত্বটি সমাজতত্ত্বের জগতে প্রাধান্য পেয়েছে তা হ'ল "Sociology of knowledge" সংক্রান্ত মতবাদ। ম্যানহাইমের মতে জ্ঞান নির্ভর সমাজতত্ত্ব হ'ল "Theory of Cognition" কিংবা সামাজিক জ্ঞান সম্পর্কিত বিজ্ঞান অথবা "Social teaching." এই ধরণের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে স্বভাবতঃই ম্যানহাইম্ প্রয়োগভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চা (যার চল সুরু হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ চলার মাঝামাঝি অবস্থায়) অস্বীকার করে এক দর্শন নির্ভর এবং জ্ঞাননিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার অবতারণা করেছিলেন। ম্যানহাইমের ভাষায় জ্ঞাননিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব, "Explores the functional dependence of each intellectual

standpoint on the differentiated social group reality standing behind it." ম্যানহাইম্ নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে জ্ঞানের সামাজিক হেতু মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। রিকার্ট এবং হেবারের মত ম্যানহাইমও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে এক পার্থক্যের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যে ধরণের জ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে তা, সেই জ্ঞান যা ঐতিহাসিক গুরুত্বের বার্তাবহ—তার চাইতে স্বতন্ত্র। ম্যানহাইমের মতে, "Knowledge which natural Science provides was not determined by a social viewpoint or social being ; that means that it was deprived of any subjectivity and its measure was the ideal of absolute truth." ম্যানহাইম্ বলেন যে "Historical knowledge" নির্ভর করে "On a definite prespective in that the historicity of the cultural phenomena we are trying to analyse would appear in an entirely different light from a different level of questioning and from another standpoint." "সত্য" (Truth) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যানহাইম্ বলেন যে সত্য সাধারণতঃ জীবনের বিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকে, নিহিত থাকে ঐতিহাসিক উপ-স্তরের মধ্যে—"Truth is the historical process itself." জ্ঞাননিষ্ঠ সমাজতত্ত্বকে ম্যানহাইম্ 'সম্পর্কজনিত' এক প্রত্যয় বলে ঘোষণা করলেন। ম্যানহাইমের ভাষায় বলা যায়, "there are spheres of thought in which it is impossible to conceive of absolute truth existing independently of the values and position of the subject and unrelated to the social context....Relativism Combines this historical Sociological insight with an older theory of know-

ledge which was as yet unaware of the interplay between conditions of existence and modes of thought, and which modelled its knowledge after static prototypes such as might be exemplified by the proposition $2 \times 2 = 4$. This older type of thought which regarded such examples as the model of all thought, was necessarily led to the rejection of all those forms of knowledge which were dependent on the subjective standpoint and the social situation of the knower, and which were, hence, merely, 'relative'."

এক কথায় বলা যায় ম্যানহাইম্ যদিও 'প্রগতিশীল পশ্চিমী বুর্জোয়া' চিন্তাধারার স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন বলে একদল সমাজ-বিজ্ঞানী মনে করেন ; তবুও ম্যানহাইমের কৃতিত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই কারণ তিনিই প্রথম সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকনিষ্ঠ উপাদানের সঙ্গে মূল্যবোধকে একত্রিত করেন নি এবং দর্শননিষ্ঠ এক সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় গড়ে তুলেছেন।

—)::(—

তৃতীয় অধ্যায় ঃ—

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার নেপথ্যে পাশ্চাত্য সমাজচিন্তাবিদ্‌গণের ভূমিকা ঃ—

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার নেপথ্যে পাশ্চাত্য সমাজচিন্তাবিদ্‌গণের ভূমিকা

প্রাচীনকালের দিকে চোখ মেলে ধরলে দেখা যাবে দর্শন, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা আইনশাস্ত্র এককথায় সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রত্যেক সমাজচিন্তাবিদ্‌গণই এক সুসংহত সমাজদর্শন নিষ্ঠ মতবাদ প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কেউই সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না তবুও সমাজতত্ত্ব বিষয়টি জন্ম দেওয়ার নেপথ্যে তাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। স্মলের ভাষায়, "on the most mediocre writer can be adequately described merely by classifying him as sociologist, historian, economist, or political scientist."

সমাজ বিশ্লেষণের সূত্র নিয়ে যাঁরা প্রথমে ভাবতে সুরু করেছিলেন তাঁরা হলেন গ্রীক সমাজচিন্তাবিদ্। "The writers of oriental antiquity were prevented by the general conditions of their social environment from offering any strikingly original generalizations concerning the origin and nature of social institutions. An agrarian economy, caste, superstition, an inflexible religious system and sumptuary legislation, begotten of the passion of the antique mind for homogeneity, tended to give social institutions a fixity and sanctity which discouraged any extensive speculation as to their origin, nature, or possible means of improvement."

ইজিপ্টিয় সভ্যতার চরিত্র ছিল নৈতিক এবং সামাজিক সংহতি ও

সামাজিক স্থায়বোধ জনিত আদর্শ। হাম্মুরাবির 'আইনে' ব্যাবিলনের সভ্যতার নেপথ্যে ফলিত সমাজতত্ত্বের কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রন্থে এবং হিব্রুদের আইনশাস্ত্রেও ফলিত সমাজ-তত্ত্বের স্পর্শ আছে। কিন্তু সক্রেটিসের যুগের পর থেকে গ্রীস দেশে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার এক প্রকৃত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বারনেসের ভাষায়, "The outstanding traits of ancient oriental social thought may safely be characterized somewhat as follows: the social thinking was informal, sporadic, and unorganised rather than systematic or the product of deliberate study. It was highly personal and individual in origin and expression, and not the outgrowth of schools or types of social thought or of conscious social analysis······the trend of social thinking was conservative and traditional, mainly retrospective in outlook."

গ্রীস দেশের সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল পৌরাণিক এবং মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথমতঃ গ্রীস দেশে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল "tribal spirit of localism and provincialism" যা গ্রীক সমাজচিন্তাবিদ্‌গণের কাছে এক উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। তাছাড়া গ্রীস দেশের শহরগুলিতে মানুষের মধ্যে এক সংহতির প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যেত এবং এই গোষ্ঠী চেতনাই সমাজের আদর্শনিষ্ঠ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছিল। প্লেটোর "Republic" এবং এরিসটটলের "Politics" উপরোক্ত উপাদান প্রভাবান্বিত চিন্তাধারারই ফসল। বারনেসের মতানুসারে, "The freedom and liberty of the

Athenian city-state and the absence of a coercive state religion made for that critical philosophy which first appeared on any considerable scale among the Attic Greeks."

প্রাক্ প্লেটো যুগে গ্রীক সমাজ দর্শন সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রচনাবলী না পাওয়া গেলেও বারনেস কিছু রচনাবলীর উল্লেখ করেছেন। হেসিওড, রক্ষনশীল মতবাদের ভিত্তিতে এক "সুবর্ণযুগের" কথা পর্যালোচনা করেছিলেন এবং তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

এনাক্সিমান্দের মানবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে "Prolongation of human infancy"-র তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। থিওগনিস্ মানবজাতির ক্ষেত্রে "Eugenics"-র সূত্র পর্যালোচনা করেন। এস্‌কাইলাস্ সভ্যতার বিবর্তনের ওপর এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন এবং হেরোডোটাস বিদেশী মানুষের আচরণ, নীতি এবং শারীরিক গড়ন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে "Descriptive Sociology"-র উন্মেষের নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সফিষ্টগণ প্রকৃতির অবস্থা এবং সেইমত সামাজিক এবং শাসননীতির গড়ন পর্যালোচনা করেন। হিপোক্রেটস্ তাঁর "Airs, Waters and Places" গ্রন্থে মানবসমাজের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা করেন। সক্রেটিস অবশেষে মানবনীতির সঙ্গে প্রাকৃতিক নীতির এক সমন্বয় ঘটান। প্লেটো "সামাজিক মনে"র অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব নিয়ে যে পর্যালোচনা করেছিলেন তার মূল্য সমাজতাত্ত্বিক তুনিয়ায় অপরিসীম। "It is interesting to note that, aside from its communistic aspects, this utopia of Plato provided for the first comprehensive scheme of eugenics in the history of social or biological philosophy." সমাজ

বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্লেটোর "Laws" এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এক কথায় বলা যায় প্লেটো সমাজকে এক একক এবং সম্পূর্ণ এক অস্তিত্ব ভেবে নিয়ে তাঁর দর্শননিষ্ঠ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে আর যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন এরিসটটল। এরিসটটল তাঁর "Politics" গ্রন্থে সামাজিক অবস্থাকে "Inductive" পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু প্লেটো "Deductive" পদ্ধতির ওপর ছিলেন নির্ভরশীল। বারনেসের ভাষায়, "Aristotle pointed out the necessity of Social relations for the complete development of the human personality, and he made plain the abnormality of the non-social being."

এরিসটটলও সমাজ বিবর্তন সংক্রান্ত পর্যালোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং তিনি "সামাজিক প্রবৃত্তি"র মাধ্যমে সমাজ বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

গ্রীস দেশে তখন আর এক দর্শননিষ্ঠ চিন্তাধারার অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল যাদের বলা হ'ত "স্টোয়িকস্" এবং "এপিকিউরান" সম্প্রদায়। জিনো ছিলেন "স্টোয়িক" মতাবলম্বী এবং তিনিই ছিলেন এই দর্শননিষ্ঠ অনুশীলন কেন্দ্রের মূল প্রবক্তা। তাঁদের মতে, "All men must be social, both for the development of their own personalities and for the proper discharge of their duties toward their fellow beings." অপরপক্ষে "এপিকিউরান" দর্শন ছিল "Individualistic" এবং "Materialistic". এপিকিউরাস ছিলেন এই শ্রেণীর চিন্তাধারার প্রবক্তা। গ্রীস দেশের সমাজচিন্তা-বিদ্‌গণের মধ্যে আর যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন পলিবিয়াস যাঁর চিন্তাধারা স্পাইনোজা, হিউম, এডাম স্মিথ, লি-বন্, স্পেঙ্গলার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের প্রভাবান্বিত করেছিল।

রোমেও গ্রীসদেশের মত এক দর্শননিষ্ঠ সমাজচিন্তার ঢেউ জেগেছিল। লুক্রেসিয়াসকে এক সমাজ বিবর্তনবাদী বললে ভুল হবে না যাঁকে 'বিবর্তনবাদী এক সমাজতাত্ত্বিক' বলে আজও মর্যাদা দেওয়া হয়। লুক্রেসিয়াস মূলতঃ ছিলেন এক কবি। কিন্তু তাঁর কবিতায় "বাচবার জন্য সংগ্রাম, যোগ্যতমের অধিকারই হচ্ছে টিকে থাকা, আদিম মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতি, ভাষা, আগুন, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদির উদ্ভব······"ইত্যাদি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। স্টোয়িক এবং এপিকিউরাসের দর্শনের ঢেউ রোমেও এসে আঘাত করেছিল। হোরেস ছিলেন এই "এপিকিউরান" দর্শনে বিশ্বাসী। মার্কাস সিসারো ছিলেন স্টোয়িক দর্শনে বিশ্বাসী এক রোমান দার্শনিক। রোমের আর এক দার্শনিক প্লোটিনাসের নামও এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যিনি ছিলেন "Neo-Platonism"-এর প্রবক্তা। জুলিয়াস সীজার তাঁর "Commentaries"-য়ে জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়া রোমের আইনশাস্ত্র এবং বিধিপ্রয়োগ সম্পর্কিত চিন্তাধারা রাষ্ট্রনীতিনিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়াকে অনেক সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পুরোণো দুনিয়ায় খৃষ্টান ধর্মের প্রসার, দর্শন ও সমাজচিন্তামূলক রচনাবলীকে যে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং যার প্রভাব আধুনিক যুগের সমাজতত্ত্বেও এসে পড়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যীশুখৃষ্টের মতবাদ এক চূড়ান্ত আদর্শনিষ্ঠ সমাজের ইঙ্গিতবহ। পলের প্রেম সম্পর্কিত মতবাদ, জৈবিক প্রকৃতিনিষ্ঠ সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্বের গুরুত্বও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তদানীন্তন খৃষ্টান পাদরীগণ যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তার গুরুত্বও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে অপরিসীম। মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁরা নিম্নরূপ মত পোষণ করতেন : "Mankind is by nature Social, Society thus being a natural product........ Senaca's "golden" State of nature, without coercive

Government, was identified with the State of man in Eden before the "Fall" of man. Civil Government was rendered necessary by that "Fall", as a remedy for the crimes and vices of mankind........ one might better endure serious social inconveniences than Jeoperdize his Salvation by dissipating his energy in attempting to improve earthly conditions........". অগাসটাইনের "City of God" এই সময়কালের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মধ্যযুগে যে সমস্ত দার্শনিক ও সমাজচিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রাবানাস মরাস্, হিঙ্কমার, এরিজেনা, এলবার্ট ম্যাগনাস, একুাইনাস, দান্তে, ডুবয়, পাদুয়ার মারসিগ্লো, সিলভিয়াস, ম্যাকিয়াভেলি, জাঁ বডিন, আইবান খলদুন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী। দান্তের "অনুকরণের সামাজিক ধারা" সম্পর্কিত তত্ত্ব ("The Banquet" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে), ডুবয়ের সমাজসংস্কারমূলক চিন্তাধারা ("De recuperatione Terre Sancte" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে), পাদুয়ার মারসিগলোর রাষ্ট্রনীতিনিষ্ঠ তত্ত্ব ("Defensor Pacis" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে), ম্যাকিয়াভেলির মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত মতবাদ ("Prince" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে), জাঁ বডিনের সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব, ("Six Books concerning the common wealth" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে), খলদুনের সভ্যতার বিবর্তনমূলক চিন্তাধারা ("Prolegomena to Universal History" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে) আধুনিক যুগের সমাজতত্ত্বকে যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং উন্নত করে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা হবস্, লক্, পাফেনডর্ফ, স্পাইনোজা, রুশো, হেলভিটিয়াস, ভিকো, টারগট, কনডোরসেট, হারডার, কান্ট প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদের বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়ে রূপান্তরীত হতে হতে সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ায় প্রবেশ করে যার প্রথম জন্ম দেন অগাস্ত কোঁত।

চতুর্থ অধ্যায়

ক) দেশভিত্তিক কিছু সমাজতাত্ত্বিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আমেরিকা

লেষ্টার ওয়ার্ড (Lester Ward)

১৮৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৩ সালে মারা যান।

১। Dynamic Sociology, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২ খণ্ডে প্রকাশিত।
২। The Psychic Factors of civilization, ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত।
৩। Outlines of Sociology, ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত।
৪। Pure Sociology ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত।
৫। Applied Sociology-১৯০৬ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত মতবাদ।
২। সামাজিক কার্য ও গঠন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

অ্যালবিওন উডবেরী স্মল (Albion Woodberry Small)

১৮৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিউটন থিওলোজিকাল স্কুল, লিপজিগ এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে মেইলের অন্তর্ভুক্ত কোল্‌বি কলেজ এবং জন হপকিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। অবশেষে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করে সম্মানিত হন।

স্মল হলেন 'American Journal of Sociology' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৬ সালে তিনি মারা যান।

১। An Introduction to the Study of Society. ভিনসেণ্টের সহিত লিখিত এবং ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত।

২। General Sociology: An Exposition of the Main Devolopment in Sociological theory From Spencer to Ratzenhofer, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত।

৩। Adam Smith and Modern Sociology, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত।

৪। The Cameralists: The Pioneers of German Social Polity. ১৯০৯ সালে প্রকাশিত।

৫। The meaning of Social Sciences, ১৯১০ সালে প্রকাশিত।

৬। Between Eras From Capitalism to Democracy, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।

৭। Origins of Sociology, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। সংঘাত নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

——:::——

চার্লস হর্টন কুলি (Charles Horton Cooley)

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কুলির পিতা ছিলেন একজন জুরী। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অবশেষে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে কুলি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Personal Competition, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত।

২। Human Nature and the Social order ১৯০২ সালে প্রকাশিত।

৩। Social Organization ১৯০২ সালে প্রকাশিত।

৪। Social Process, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত।

৫। Sociological Theory and Social Research ১৯৩০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। গোষ্ঠী সম্পর্কিত মতবাদ।

রবার্ট পার্ক (Robert Park)

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ক পড়াশুনা করেন।

১৮৮৭-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনবিভাগে তিনি কিছুকাল সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। পরে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে পার্ক মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Introduction to the Science of Sociology বার্জেসের সহিত লিখিত এবং ১৯২১ সালে প্রকাশিত।

২। Old World Traits Transplanted, ম্যুলারের সহিত লিখিত এবং ১৯২১ সালে প্রকাশিত।

৩। The Immigrant Press and Its Control, ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

৪। The City, বার্জেসের সহিত লিখিত এবং ১৯২৫ সালে প্রকাশিত।

৫। Race and Culture, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

৬। Human Communities, ১৯৫২ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। নগর সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। জাতি সম্পর্কিত আলোচনা।

৩। ইকোলজি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—:।:—

এডওয়ার্ড এলসওয়ার্থ রস্ (Edward Ross)

১৮৬৬ সালে ইলিনয়েসে জন্মগ্রহণ করেন। জনস্ হপকিনস্

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এক বছরের জন্য তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। প্রথমে নেব্রাসকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন। গেব্রিয়েল টারডের চিন্তাধারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। The Principle of Sociology, ১৯২০ সালে প্রকাশিত।

২। New-Age Sociology, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। মোট নিবন্ধের সংখ্যা-২৯।

চিন্তাধারার ফসল :

১। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব :

২। সামাজিক আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব :

রবার্ট ম্যাকাইভার (Robert Maciver)

১৮৮২ সালে স্কটল্যাণ্ডের ষ্টরনোওয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আবেরডিন বিশ্ববিদ্যালয়, টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বারনার্ড কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "লাইবর প্রফেসর" (সমাজতত্ত্ব) হিসাবে নিযুক্ত হয়ে সম্মানিত হন। New School for Social Research-এর তিনি ছিলেন সভাপতি।

১। Community : A sociological study ১৯১৭ সালে প্রকাশিত।

২। Labor in the changing world, ১৯১৯ সালে প্রকাশিত।

৩। The elements of social science. ১৯২১ সালে প্রকাশিত।

৪। The modern state ১৯২৬ সালে প্রকাশিত।

৫। The contribution of sociology and social work ১৯৩১ সালে প্রকাশিত।

৬। Society : Its structure and changes ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত।

৭। Society : A Text Book of Sociology ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত।

৮। Leviathan and the People, ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত।

৯। Social causation, ১৯৪২ সালে প্রকাশিত।

১০। The Web of Government, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।

১১। Society : An Introductory Analysis পেজের সহিত লিখিত এবং ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।

১২। Democracy and the Economic Challenge, ১৯৫২ সালে প্রকাশিত।

১৩। Academic Freedom in our time. ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

১৪। The Pursuit of Happiness: A Philosophy for Modern Living. ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

১৫। Life : Its Dimensions and its Bounds ১৯৬০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনা।

২। কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কিত তত্ত্ব।
৩। সাধারণ সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পর্যালোচনা।

উইলিয়াম অগবার্ণ (W. Ogburn)

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। রীড্ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। অবশেষে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অগবার্ণ "The Journal of the American Statistical Association" এর সম্পাদক ছিলেন। গিডিংসের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৫৯ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :—

১। Social Change with Respect to Culture and Original Nature, ১৯২২ সালে প্রকাশিত।
২। The Social Sciences and their Interrelations, আলেকজাণ্ডার গোল্ডেনওয়াইজারের সহিত লিখিত এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত।
৩। The Economic Development of Post-war France ডব্লু জাফির সহিত লিখিত এবং ১৯২৯ সালে প্রকাশিত।
৪। Sociology, নিমকফের সহিত লিখিত এবং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত।
৫। The Social Effects of Aviation, জে. জে. এডামস্ এবং গিলবিলানের সহিত লিখিত এবং ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত।

৬। Technology and changing Family নিমকফের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। কৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। কৃষ্টির অপূর্ণতা সম্পর্কিত মতবাদ।

——ঃ০ঃ——
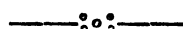
আরনেষ্ট ডব্লু বার্জেস (Arnest W. Burgess)

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়, কানসাস্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তিনি ছিলেন "এমেরিটাস প্রফেসর"।

১। Introduction to the Sciences of Sociology পার্কের সহিত লিখিত এবং ১৯২১ সালে প্রকাশিত।

২। The City, পার্কের সহিত লিখিত এবং ১৯২৫ সালে প্রকাশিত।

৩। Predicting Success or Failure in Marriage, কট্রেলের সহিত লিখিত এবং ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত।

৪। The Family : From Institution to companion ship ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত।

৫। Engagement and Marriage, পি. ওয়ালিনের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত।

৬। Contributions to Urban Sociology (সম্পাদিত) ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :—

১। পরিবার এবং বিবাহ সম্পর্কিত মতবাদ।

২। নগর সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব (কনসেনট্রিক জোন মডেল)

৩। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

——::——

ষ্টুয়ার্ট চ্যাপিন (Stuart Chapin)

১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ওয়্যালেসলি কলেজ, স্মিথ কলেজ এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১। An Introduction to the Study of Social Evolution, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।

২। Field work and Social Research, ১৯২০ সালে প্রকাশিত।

৩। Cultural Change, ১৯২৮ সালে প্রকাশিত।

৪। Contemporary American Institutions, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত।

৫। Experimental Designs in Sociological Research, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ।

—০—

পিটিরিম্ সোরোকিন্ (Pitirim Sorokin)

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট পিটাস বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করেন এবং প্রথমে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে আমেরিকার মিনেসোটা এবং হারভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রাশিয়ায় থাকাকালীন তিনি আলেকজাণ্ডার কেরেনেস্কির একান্ত সচিব হিসাবে কাজ করতেন। তদানীন্তন কম্যুনিষ্টরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং নির্ব্বাসন দণ্ড দেন। সোরোকিন্ 'International Institute of Sociology', The German and Ulkrainian Sociological Societies'' এবং "Czechoslovakian Academy of Agriculture" এর সভ্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি "American Sociological Association" এর সভাপতি হিসাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Social Mobility, ১৯২৭ সালে প্রকাশিত।

২। Contemporary Sociological Theories, ১৯২৮ সালে প্রকাশিত।

৩। Social and Cultural Dynamics ১৯৩৭-৪১ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত।

৪। Socio-cultural Causality, Space, Time, ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত।

৫। Society, Culture and Personality, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত।

৬। Social Philosophy in an Age of Crisis, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

৭। Fads and Foibles in Modern Sociology, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

৮। Sociological Theories of Today, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। বৃত্তাকার সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—০—

মার্গারেট মিড্ (Margaret Mead)

১৯০১ সালে ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বারনার্ড কলেজ থেকে A. B. ডিগ্রী এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। মিড্ ছিলেন National Research Council-এর বৃত্তিপ্রাপ্তা। কিছুকাল তিনি আমেরিকান মিউজিয়াম অব্ ন্যাচারাল হিস্ট্রি'র কিউরেটার হিসাবে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের "Adjunct" প্রফেসরের পদ লাভ করে সম্মানিতা হন। ১৯৭৮ সালে তিনি মারা যান।

১। Coming of Age in Samoa, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।
২। Male and Female, ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত।
৩। New lives for old : Cultural Transformation, ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত।
৪। An Anthropologist at work : writings of Ruth Benedict, ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত।
৫। Continuities in Cultural Evolution, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত।
৬। Culture and Commitment, ১৯৭০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। প্রাচীন সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা।
২। কৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—::—
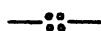
ট্যালকট্‌ পারসনস্‌ (Talcott Parsons)

১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে আমহার্ষ্ট কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী পান। পারসনস্‌ ছিলেন হবহাউস, জিনস্‌বার্গ এবং মালিনোভোস্কির ছাত্র। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। আমহার্ষ্ট কলেজ এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। "New Department of Social Relations" এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে "American Sociological Society"র সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। The Structure of Social Action, ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত।

২। Essays in Sociological Theory, Pure and Applied, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।

৩। The Social System, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

৪। Toward a General Theory of Social Action, এডওয়ার্ড শীলস্‌এর সহিত লিখিত এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

৫। Working Papers in The theory of Action, এডওয়ার্ড শীলস্ এবং এফ. বেলসের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত।

৬। Family, Socialization and Interaction Process, স্মেলসারের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত।

৭। Theories of Society.

৮। Societies : Evolutionary and Comparative Perspectives.

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। সামাজিক গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কিত মতবাদ।

৩। সামাজিক কার্য সম্পর্কিত মতবাদ।

মেয়ার. এফ নিমকফ্. (M. F. Nimkoff)

১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

A. B. ডিগ্রী এবং সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বাক্‌নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন। ফ্লোরিডা ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করে সম্মানিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। The Family, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত।

২। Marriage and the Family, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত।

৩। Sociology, অগবার্ণের সহিত লিখিত এবং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত।

৪। Technology and the Changing Family, অগবার্ণের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। পরিবার সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

হেনস্‌ গার্থ (Hans Gerth)

জার্মানীর অন্তর্ভূক্ত কাসেলে ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হাইডেলবার্গে পড়াশুনা করেন। গার্থ ছিলেন কার্ল ম্যানহাইমের ছাত্র। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। From Max Weber : Esays in Sociology.
২। The Religion of China, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।
৩। Ancient Judaism, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।
৪। Character and Social Structure : The Psychology of Social Institutions, সি. রাইট মিলসের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত।
৫। The Religion of India, মার্টিনডেলের সহিত লিখিত এবং ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১। ভূমিকা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনা।
২। সামাজিক গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব

জর্জ হোমানস. (George Homans)

১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রথমে ফেলো এবং সমাজতত্ত্বের নির্দেশক এবং পরে সেই বিভাগেরই অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। An Introductihn to Pareto, সি. পি. কার্টিসের সঙ্গে লিখিত এবং ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত।
২। English Villagers of the Thirteenth Century, ১৯৪১ সালে প্রকাশিত।
৩। The Human Group, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। কার্যনির্ভর সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব

২। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

৩। গোষ্ঠী সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—•—

রবার্ট মার্টন (Robert Merton)

১৯১০ সালে ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে A. B. ডিগ্রী এবং ১৯৩৬ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী হিসাবে এবং ১৯৩৬ সালে নির্দেশক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, ১৯৪০ সালে প্রফেসর এবং ১৯৪১ সালে চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন। মার্টন "Bureau of Applied Social Research" এর সহযোগী আধিকারিক এবং 'American Sociological Society'র সভাপতি ছিলেন।

১। Mass Persuasion, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত।

২। Social Theory and Social Structure, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।

৩। Continuities and Social Research, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। কার্যনির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

—•—

সি. রাইট মিলস্ (C. Wright Mills)

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গার্থ এবং বেকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৪১ সালে উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তিনি অধ্যাপক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। The New Men of Power, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত।

২। The Puerto Rican Journey, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

৩। White Collar : The American Middle Classes, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

৪। The Power Elite, ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত।

৫। The Sociological Imagination, ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত।

৬। The Marxists.

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। ভূমিকা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ।

৩। "এলিট ধারণা" সম্পর্কিত আলোচনা।

—•—

মেরিয়ন লেভী (Marion Levy)

টেক্সাসের অন্তর্গত গালভেষ্টনে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে A. B. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রী পান। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। The Stucture of Society, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত।

২। Eufunction, Dysfunction, Eustructure and Dystructure.

চিন্তাধারার ফসল :

১। কার্যনির্ভর এবং গঠন নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব।

খ) দেশভিত্তিক কিছু সমাজতাত্ত্বিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ব্রিটীশ যুক্তরাজ্য

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)

১৮০৯ সালে স্রসবেরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ডারউইনের পিতা তাঁকে ধর্মযাজক করার নিমিত্তে কেমব্রিজে নিয়ে আসেন। ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি এইচ. এম. এস. বিগল জাহাজে চড়ে পাড়ি জমান, কারণ তিনি ছিলেন একজন প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিবিদ্। পরে অবশ্য ডারউইন তাঁর "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" এবং "টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম" সম্পর্কিত তত্ত্বের মাধ্যমে বিবর্তনবাদী বলে পরিচিত হন। ১৮৮২ সালে ডারউইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১। The Structure and Distribution of Coral Reefs, ১৮৪২ সালে প্রকাশিত।
২। Evolution by Natural Selection, (সহলেখক ছিলেন ওয়ালেস) ১৮৪২-১৮৫৮ সালের রচনা।
৩। On the origin of the Species, ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত।
৪। The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, ১৮৭১ সালে প্রকাশিত।
৫। The Expression of the Emotions in Man and Animals, ১৮৭২ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। জৈবিক বিবর্ত্তনমূলক তত্ত্ব।
২। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনমূলক মতবাদ।
৩। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

হেনরী মেইন্ (Henry Maine)

১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অধ্যাপক। তিনিই প্রথম "Anthropological Jurisprudencc"-এর চর্চা সুরু করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী

১। "Ancient Law : Its Connection with the Early History of Society And Its Relations to Modern Ideas," ১৮৬১ সালে প্রকাশিত।

২। "Village Communities in the East and West to Which Are Added other Lectures, Addresses and Essay, ১৮৭১ সালে প্রকাশিত।

৩। "Lectures on the Early History of Institution," ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল

১। মর্য্যাদা ও চুক্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। অপরাধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত তত্ত্ব।

এডওয়ার্ড বার্ণেট টেলর (Edward Burnett Tylor)

১৮৩২ সালে টেলর লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। টটেনহামে তাঁর

শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারের খামারের কাজে তিনি ষোল বৎসর বয়সে যোগদান করেন। ১৮৭১ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসাবে সম্মানিত হন। ১৯১৭ সালে তিনি মারা যান।

১। Anahuae; or, Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern, ১৮৬১ সালে প্রকাশিত।
২। Primitive culture, ২ খণ্ডে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত।
৩। Anthropology : An Introduction to the Study of Man and Civilizations, ১৮৮১ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সমাজ বিবর্ত্তন মূলক তত্ত্ব।
২। প্রাচীন ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ।
৩। সভ্যতা ও কৃষ্টিসংক্রান্ত তত্ত্ব।

চার্লস বুথ (Charles Booth)

১৮৪০ সালে চার্লস বুথ লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। কোন এক জাহাজের কোম্পানিতে কাজ করার জন্য তিনি স্কুল পরিত্যাগ করেন এবং পরে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এক জাহাজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত বিয়াট্রিস ওয়েবের দূরসম্পর্কীয় বোন এবং ঐতিহাসিক ম্যাকুলের ভাই-ঝি। চার্লস বুথ ১৯১৬ সালে মারা যান।

১। Life and Labour of the People in London (১৭ খণ্ডে ১৮৮৯-১৯০৩ সালে প্রকাশিত)
২। Old age Pensions and the Aged Poor : A Proposal, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত।
৩। Poor Law Reform, ১৯১০ সালে প্রকাশিত।
৪। Industrial Unrest and Trade Union Policy.

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। দারিদ্র্য সংক্রান্ত তত্ত্ব
২। সামাজিক বিধান সম্পর্কিত মতবাদ।

—•—

লিওনার্দ হব্‌হাউস (Leonard Hobhouse)

১৮৬৪ সালে হব্‌হাউস জন্মগ্রহণ করেন। মার্টন কলেজের ফেলো হিসাবে সম্মানিত হন। "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" এর সদস্য ছিলেন। ১৯০৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রথম "মার্টিন হোয়াইট প্রফেসারের" পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে হব্‌হাউস মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। The Labour movement, ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত।
২। The Theory of knowledge : A contribution to some Problems of Logic and Metaphysics, ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত।

৩। Mind in Evolution, ১৯০১ সালে প্রকাশিত।

৪। Democracy and Reaction, ১৯০৪ সালে প্রকাশিত।

৫। Morals in Evolution : A Study in Comparative Ethics, ১৯০৬ সালে প্রকাশিত।

৬। Liberalism, ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

৭। Social Evolution and Political Theory, ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

৮। Development and Purpose : An Essay towards a Philosophy of Evolution, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।

৯। Social Development : Its Nature and Conditions, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। সমাজ বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ।

৩। জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

—o—
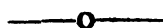
রেডক্লিফ ব্রাউন (Redcliffe Brown)

১৮৮১ সালে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান। কেপ্ টাউন, সিডনি, শিকাগো এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাছাড়া ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন ভিজিটিং প্রফেসর,

আলেক্জান্দ্রিয়ার "ফারুক ওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Social Studies"-এর আধিকারিক এবং প্রফেসর ও উত্তর আফ্রিকার রোডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৫৫ সালে ব্রাউন মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) "The Definition of Totemism," ১৯১৪ সালে প্রকাশিত।

২) "The Andaman Islanders," ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

৩) "Structure and Function in Primitive Society : Essays and Addresses," ১৯২৩-৪৯ সালে রচিত।

৪) "The Social Organization of Australian Tribes," ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত।

৫) "A Natural Science of Society," ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১) সামাজিক গঠন ও কার্য সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

২) সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব

৩) মূল্যবোধ সম্পর্কিত তত্ত্ব।

আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee)

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বইটি প্রণয়ণ করে খ্যাতি লাভ করেছেন সেই বইটির নাম "A Study of History." বইটি বারোটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। দানিলোভস্কি এবং

স্পেঙ্গলারের মত টয়েনবিও ইতিহাসের কিছু একক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যে এককগুলিকে টয়েনবির ভাষায় "Social atoms" বলা হয়। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত চর্চার ক্ষেত্রে টয়েনবি'র অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। "High religion" সম্পর্কিত তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের এক নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। তাছাড়া তিনি সভ্যতার শ্রেণীবিভাগ, "ডমিনেন্ট মাইনরিটি ও ইনটারন্যাল প্রলেতারিয়েত" এবং কৃষ্টির পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন। সমাজের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে টয়েনবি বলেছেন, "that the intelligible unit of historical study is neither a nation state nor mankind as a whole but a certain grouping of humanity which we have called a society."

——::——
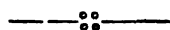
মরিস জিনস্‌বার্গ (Morris Ginsberg)

মরিস জিনস্‌বার্গ এক প্রখ্যাত ব্রিটীশ সমাজতাত্ত্বিক। 'London School of Economics'-এর তিনি ছিলেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। হব্‌হাউস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার তিনি ছিলেন এক অনুরাগী সমর্থক। লণ্ডনের "Sociological Society"-র সঙ্গে তিনি বহুকাল যুক্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল : (১) Reason and Unreason in Society (১৯৪৭ সালে প্রকাশিত); (২) "Essays in

Sociology and Social Philosophy" (১৯৫৭ সালে প্রকাশিত); (৩) "The Psychology of Society" (১৯২১ সালে প্রকাশিত); (৪) "The idea of Progress : A Revaluation" (১৯৫৩ সালে প্রকাশিত); (৫) 'Sociology' (১৯৬৩ সালে প্রকাশিত); (৬) "Studies in Sociology" (১৯৩২ সালে প্রকাশিত); (৭) G. C. Wheeler-এর সহিত লিখিত, "The Material Culture and Social Institutions of the Similar Peoples", (১৯১৫ সালে প্রকাশিত)।

জিনস্‌বার্গ সমাজতত্ত্বকে বর্ণণা করেছিলেন সমাজের যে কোন প্রকার সম্পর্ককে নিয়েই। তাঁর কথায় সমাজতত্ত্ব হ'ল মানুষের সম্পর্ক সম্পর্কিত "Whether these be direct or indirect, organized or unorganized, conscious or unconscious, cooperative or antagonistic". সামাজিক গঠন সম্পর্কে জিনস্‌বার্গের মতবাদ হ'ল সমাজের প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠীর জটিলতাই সামাজিক গঠনের প্রেক্ষাপট। জিনস্‌বার্গ সমাজতত্ত্বের বিষয়কে মোট চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন :

ক) সামাজিক গঠন বৈশিষ্ট্য ; খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রন ; গ) সামাজিক পদ্ধতি কিংবা ধারা ; ঘ) সামাজিক ব্যাধি। উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মনে রেখে তিনি বললেন, "Sociology is the Study of human interactions and interrelations, their conditions and consequences."

বিবর্তন এবং প্রগতি সম্পর্কিত আলোচনাকালে জিনস্‌বার্গ সরল অবস্থা থেকে জটীল অবস্থামুখী যে গতি তাকে বিবর্তন বলে চিহ্নিত করেন যার কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই এবং যা যে কোন সময়েই বিঘ্নিত হতে পারে। যদি বিবর্তনকে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয় যার মাধ্যমে নতুন কিছুর জন্ম হবে কিন্তু "an orderly Continuity

in transition" থাকবে তবে সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে কারো কোন মতভেদ থাকবে না।

জিনস্‌বার্গ সামাজিক প্রগতিকে সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং বলেছেন, প্রগতি হ'ল, "a development or evolution in a direction which satisfies rational criteria or value." জিনস্‌বার্গ অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকদের মত "মূল্যবোধ" প্রত্যয়টি বাদ দেননি বরঞ্চ প্রগতির সঙ্গে মূল্যবোধকে যুক্ত করেছেন। সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার সম্পর্কে জিনস্‌বার্গের তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তিনি নিম্নলিখিত কারণগুলোকে সামাজিক পরিবর্তনের স্বপক্ষে বিশ্লেষণ করেছেন: ক) মানুষের ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত (পাশ্চাত্ত্য দেশে ছোট পরিবারের উদ্ভব); খ) পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে মানুষের কর্মধারার পরিবর্তন (১৩০০-১৫০০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের গ্রামীন সমাজের পরিবর্তন); গ) গঠনমূলক পরিবর্তন এবং সেইমত চাপের উদ্ভব (উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদন সম্পৃকিত সম্পর্কের মধ্যে অনৈক্য); ঘ) অন্য সমাজের সংস্পর্শে এসে বাহ্যিক পরিবর্তন; ঙ) বিশেষ মেধা সম্পন্ন মানুষ এবং গোষ্ঠী চ) যুদ্ধবিগ্রহ; ছ) নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উদ্ভব।

মরিস জিনস্‌বার্গকে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকেরা বুর্জোয়া শিবিরের আওতায় ফেলেছেন। "আদর্শ" সংক্রান্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা তিনি যেভাবে দিয়েছেন তা মার্কসীয় দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি 'আদর্শকে' "open" এবং "close" এই দুটি পর্য্যায়ে ভাগ করেছেন। কার্ল পপারের চিন্তাধারা তাঁকে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকালে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাঁর মতে "Liberalism, Conservatism, Socialism" ইত্যাদি হ'ল "Open Ideology"-র অন্তর্গত।

"Closed Ideology" হ'ল "Self Contained and Complete Systems demanding all or none Commitment, of the kind demanded by, for example, Bolshevist Communism."

——:::——

গ) দেশভিত্তিক কিছু সমাজতাত্ত্বিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ফ্রান্স

ফ্রেডারিক লে প্লে (Frederic Le Play)

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্ভূক্ত নরম্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Les ouvriess, মূল ফরাসী ভাষায় ৬ খণ্ডে প্রকাশিত।

২। Le re´forme Social en France, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৬৪ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত।

৩। L' organization de La Formille : Selon-Le-vrai modele´ signale´ Per L' histoire de toutes les races-etde tousles temps, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৭১ সালে প্রকাশিত।

৪। La Paix Sociale apre´s Le de´sastre, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৭১ সালে প্রকাশিত।

৫। La constitution de L' Angleterre, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত।

৬। La reforme en l' Europe et le Salat´en France, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—০—

গ্যুইলাইম্-ডি-গ্রিফ্ (Guillaume De Greef)

১৮৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাজতাত্ত্বিক। ১৯২৪ সালে গ্রিফ্ মারা যান।

গ্রন্থ ঃ

১। Introduction a' la Sociologie, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। মৌলিক সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত মতবাদ।

২। সমাজ প্রগতি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—০—

রেনি ওয়ার্মস (Rene Worms)

১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি "International Institute of Sociology"র সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। ওয়ার্মস "Revue International de Sociologie" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ সালে মারা যান।

১। Organicism and Society, ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত।

২। Philosophy of the Social Sciences, ১৯০৩-১৯০৭ সালে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত।

৩। The Biological Principles of Social Evolution, ১৯১০ সালে প্রকাশিত।

৪। 'La Sociologie,' ১৯২১ সালে মূল ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ।

২। সমাজ ও জৈবিক অবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব

৩। সংহতি ও ঐক্য এবং অসংহতি ও অনৈক্য সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

—— ঃঃ ——

গেব্রিয়াল টারডে (Gabriel Tarde)

১৮৪৩ সালে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত সারলাটে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় ছিল তাঁর ঝোঁক। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রিসভার পরিসংখ্যান দপ্তরের তিনি ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। কলেজ ডি ফ্র্যান্সে তিনি আধুনিক দর্শনের প্রফেসর হিসাবেও কাজ করেছেন। ১৯০৪ সালে টারডে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। La Criminalite comparee´ (comparative criminality) ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত।

২। La Philosophie Penale, ১৮৯০ সালে প্রকাশিত।

৩। Les lois de l´imitation (The Laws of Imitation) ১৮৯০ সালে প্রকাশিত।

৪। Les lois Sociales (Social laws) ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত।

৫। La logique Sociale, মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত।

৬। E´tudes de Psycholozie Sociale (Studies in Social Psychology') ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত।

৭। L' Opinion et ta foule (opinion and the Mob) ১৯০১ সালে প্রকাশিত।

৮। Psychologie Economique, মূল ফরাসী ভাষায় ২ খণ্ডে ১৯০২ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব।

২। সামাজিক মন সম্পর্কিত মতবাদ।

৩। অনুকরণ সম্পর্কিত ধারণা।

—০—

সেলিষ্টিন বাগল্ (Celestin Bougle)

১৮৭০ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। টাউলাউজ বিশ্ববিদ্যালয়

এবং সরবোন´ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অধ্যাপক। ১৯৪০ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) "What is Sociology ?, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত।

২) Lecons de Sociologie Sur l'evolution des Values," ১৯২২ সালে প্রকাশিত এবং H. S. Sellers কর্তৃক "The Evolution of Values" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৩) "Les Sciences Sociales en allemague" (The Social Sciences in Germany), ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত।

৪) "Les Idees egalitaires," মূল ফরাসী ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত।

৫) "Essais Sur le regime des Castes" (Essays on the Caste System), ১৯০৮ সালে প্রকাশিত।

৬) "La Sociologie de Proudhon," মূল ফরাসী ভাষায় ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

৭) "Le Solidarisme" (Solidarity), মূল ফরাসী ভাষায় ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

৮) Humanisme, Sociologie, Philosophie," মূল ফরাসী ভাষায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১) জাতিতত্ত্ব (ভারতীয়) সম্পর্কিত আলোচনা।

২) সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

৩) সামাজিক গঠনের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য।

জর্জ গারভিচ্ (George Gurvitch)

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন। গারভিচ্ ফ্রান্সের "Centre d Etudes sociologiques" এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিছুকাল cahiers internation aux d Sociologie পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। "New School for Social Research" কেন্দ্রে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। L' Idée du droit Social (The Concept of Social Justice) ১৯৩১ সালে প্রকাশিত।

২। Morale theorique et Science X des moeurs (Theoretical Ethics and the Science of the Mores) ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত।

৩। Essais de Sociologie (Essays of Sociology) ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত।

৪। Elements de Sociologie Juridiue (Elements of Sociological Jurisprudence) ১৯৪০ সালে প্রকাশিত

৫। Industrialization et technocratie (Industrialization and technology) ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।

৬। Sociology of Law (১৯৪২ সালে প্রকাশিত) । ।

৭। The Bill of Social Rights, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত।

৮। La vocation actuelle de La Sociologie (The real vocation of Sociology) ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। আইন সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

২। রাজনৈতিক সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব।

—o—

লেভি স্ত্রাউস্ (Levi Strauss)

১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বোনেই তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৩৫ সালে ব্রাজিলের সাও-পলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যান্ত নিউইয়র্কের "New School for Social Research"-এর "ভিজিটিং প্রফেসর" হিসেবেও কাজ করেছেন। আমেরিকার ফ্রান্স দূতাবাসের তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা। "College de France"-এরও তিনি ছিলেন অধ্যাপক। তিনি ১৯৪৯ সালে "Prix Paul Pelliot" এবং ১৯৬৫ সালে "Huxley Memorial" মেডেল পাবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Structural Anthropology, ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত।

২। The Elementary Structure of Kinship.

৩। "La Structure et la forme", মূল ফরাসী ভাষায় ১৯৬০ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সমাজ গড়ন সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। সমাজ সম্পর্ক সমন্বিত তত্ত্ব

—o—

ঘ) দেশভিত্তিক কিছু সমাজতাত্ত্বিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জার্মানী এবং পোলাণ্ড

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (Frederich Engels)

১৮২০ সালে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত বার্মেনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪২ সালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি ফার্মে চাকুরীতে নিযুক্ত হ'ন। ১৮৪৪ সালে প্যারিসে কার্ল মার্কসের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ১৯০৫ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। "The Conditions of the working class in England in 1844," ১৮৪৫ সালে রচিত।

২। "Family, Private Property and the Origin of State."

৩। "The Communist Manifesto", (সহযোগী লেখক), ১৮৪৮ সালে রচিত।

৪। "Ludwig Feuerbach and the outcome of German Classical Philosophy".

৫। "Wage Labour and Capital", প্রথম খণ্ড, মার্কসের সহিত লিখিত "Selected Works"-য়ে সংযোজিত এবং ১৮৪৯ সালে রচিত।

৬। "The First Indian War of Independence", মার্কসের সহিত লিখিত এবং ১৮৫৭-৫৯ সালে রচিত।

৭। "The Civil War in the United States", মার্কসের সহিত লিখিত এবং ১৮৬১-৬৬ সালে রচিত।

৮। "Critique of the Gotha Programme", মার্কসের সহিত লিখিত, ১৮৫৭ সালে রচিত।

৯। "On Colonialism", মার্কসের সহিত লিখিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সংঘাত সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা

২। সামাজিক বিবর্তন

ফ্র্যাঞ্জ ওপেনহাইমার (Franz Oppenheimer)

১৮৬৪ সালে বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যায়ন করার পর বার্লিনে তিনি কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্ হিসেবে কাজ করেন। ১৯০৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের "Privatdozent"-চেয়ার অলংকৃত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তিনি ছিলেন অর্থনীতি বিষয়ের উপদেষ্টা। ১৯১৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৩ সালে ওপেনহাইমার মারা যান।

১। "Der Staat", ১৯০৭ সালে রচিত এবং জে. এম. গিটারম্যান কর্তৃক "The State" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

২। "Die Siedlungsgenossenschaft" (The Communal Association), ১৮৯৬ সালে রচিত।

৩। "Mein Wissenschaftlicher Weg" (My Scientific Course), ১৯২১ সালে রচিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। রাষ্ট্র সংক্রান্ত তত্ত্ব

২। সমাজতত্ত্ব নির্ভর অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি নির্ভর অর্থনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব।

——:•:——

আলফ্রেড ভিয়ারখন্দ ('Alfred Vierkandt)

১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাতত্ত্ব এবং কৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনাতেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :—

১। Naturvolker and Kulturvolker (Natural Peoples and Cultural Peoples) ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত।

২। Die Stetigkeit in Kulturwandel (The order in Cultural Change), ১৯০৮ সালে প্রকাশিত।

৩। Gesellschaftslehre : Haupt Probleme der Philosophischem Soziologie (The Study of Society : Main Problems of Philosophical Sociology), ১৯২৩ সালে প্রকাশিত।

৪। Kleine Gesellschaftslehre (Small Studies of Society), ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১। লৌকিক সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। কৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

—)::(—

অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার (Oswald Spengler)

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ছিল তাঁর পেশা। ১৯৩৬ সালে মারা যান।

গ্রন্থ :

১। Der Untergang des Abenlaudes (২ খণ্ডে ১৯১৮-২৩ সালে প্রকাশিত)। মূল গ্রন্থ অ্যাটকিন্‌সন কর্তৃক "Decline of the West" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

ম্যাক্স স্কেলার (Max Scheler)

১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলোগ্‌নি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৮ সালে মারা যান।

১। Wesen Und Formen der Sympathie, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ পিটারহেল্‌থ কর্তৃক "The Nature of Sympathy" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

২। Philosophische Weltanschauung, ১৯২৯ সালে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ অস্কার হ্যাক কর্তৃক "Philosophical Perspective" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৩। Schriften zur Soziologie Und Weltanschauungs lehre, ৩ খণ্ডে ১৯২৩-২৪ সালে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ "Writings in Sociology and Philosophy" নামে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত।

৪। Versuche zu einer Soziologie des wissens (Essays toward a Sociology of Knoweldge) ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

৫। Die wissensformen Und die Gesellschaft, (Forms of knowledge and Society) ১৯২৬ সালে প্রকাশিত।

৬। Bidung Und wissen (Culture and Knowledge) ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১। জ্ঞান সম্বন্ধীয় সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব

২। লৌকিক সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

—o—

লিওপোল্ড ফন্‌ভিজে (Leopold Von Wiese)

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইলেসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বার্লিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কলোগ্‌নি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর হিসাবে কাজ করতেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। Aellgemine Soziologie ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

২। Geteeldelehre, মূল গ্রন্থ বেকার কর্তৃক "Systemetic Sociology" নামে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত।

৩। Sociology, ১৯৪১ সালে প্রকাশিত।

৪। Sociology : Its History and Main Problems, ১৯২৮ সালে প্রকাশিত।

৫। The World Economy as a Sociological Structure, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত।

৬। Gesellschaftliche Stande Und Klassen (Societal Estates and classes) ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

৭। Abhangigkeit Und Sebststandigkeit im Sozialen Leben (Dependence and Independence in Social life") ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। লৌকিক সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ।

ব্রনিস্‌ল মালিনোভ্‌স্কি (Bronislow Malinowsky)

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের অন্তর্গত ক্র্যাকাও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জাগেলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রীলাভ করেন। "London School of Economics" থেকেও তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি "Robert Mond Travelling Studentship" এবং "Cons-

tance Hutchinson Scholarship" লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। 'Culture', ১৯৩১ সালে 'Encyclopaedia of the Social Sciences'-এ লিখিত।

২। The Dynamics of Cultural Change, ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত।

৩। Magic, Science and Religion, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত।

৪। Argonauts of the Western Pacific, ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

৫। Myth in Primitive Psychology, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত।

৬। Law and Order in Polynesia, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত।

৭। Family among the Australian Aborigines : A Sociological Study, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।

৮। Sex and Repression in Savage Society, ১৯৩১ সালে প্রকাশত।

৯। Crime and Custom in Savage Society, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত।

১০। A Scientific theory of Culture and other Essays, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত।

১১। Freedom and Civilization, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত।

১২। Sex, Culture and Myth, ১৯১৩-৪১ সালে রচিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। কৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। 'আত্মীয়তার বন্ধন' সম্পর্কিত আলোচনা।

৩। প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্ব।

৪। কার্য-নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার উন্মেষ

ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার উন্মেষ।

ভারতবর্ষে এখনো পর্যান্ত কোন নিজস্ব সমাজতত্ত্বের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে কিনা এ নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। তবে একথা মানতেই হবে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি ভারতবর্ষে তুলনায় নতুন হলেও সমাজ সম্বন্ধীয় গবেষণা ভারতবর্ষে এক নিজস্ব ভঙ্গীতে বহুকাল ধরেই চলছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশের চাইতে স্বভাবতই কিছুটা আলাদা। এর মূল কারণ হল ধর্মের ব্যাপকতা এবং বিভিন্নতার বিচিত্র অভিব্যক্তি। এই সূত্রে ক্রাম্বের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, যিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ শুধুমাত্র এশিয়ারই ইতালি নয়—ভারতবর্ষ ভাবপ্রবণতা কিংবা সৌন্দর্যেরই দেশ নয়······ভারতবর্ষ হল ধর্মের এক পীঠস্থান।" আদিকাল থেকে এর সূচনা—অনন্তকাল পর্যান্ত এর ব্যাপ্তি এবং প্রসারতা। এই ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের দর্শন। রাজতন্ত্রের সময়কালে শুধুমাত্র পণ্ডিতেরাই নয় রাজাদের মধ্যেও ধর্মভিত্তিক মনুষ্যত্বের এক দর্শন পরিলক্ষিত হ'ত।

রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ কিংবা মনুশাস্ত্রে মনুষ্যত্বের ধর্মপ্রচারেরই এক ইঙ্গিত রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীন সভ্যতা থেকে নবজাগরণের যুগ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনীতি কিংবা অর্থনীতি নির্ভর এক ধর্মতত্ত্ব ভারতবর্ষের সমাজ বিশ্লেষণের স্বপক্ষে রচিত হয়েছিল। কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্র, শংকরের দর্শন কিংবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-এর মনুষ্যত্ব সম্পর্কীয় ধর্মতত্ত্ব তারই ইঙ্গিত বহন করে। এমন কি নবজাগরণের শেষ পর্য্যায়ের লোকনেতা মহাত্মা গান্ধীও এই মনুষ্যত্ব নির্ভর ধর্মতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়াছেন অনেক বেশী। এই সূত্রে গান্ধীর একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। "যদি তুমি আমার নাক কেটে নাও তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি

আমার চোখ দুটো তুলে নাও তবুও তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু যদি তুমি আমার ঈশ্বরে বিশ্বাসকে হত্যা করতে পারো তবেই বুঝবে আমি মৃত।"

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার হয় যে সমাজ বিশ্লেষণের স্বপক্ষে একদল পণ্ডিত যাঁদের Radicalist আখ্যা দেওয়া যায়, মনুষ্যত্বের ধর্মপ্রচারেই ব্রতী হয়েছিলেন। সমাজ যদি মানবজাতির এক ধারণা সম্ভূত ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হয় তবে যাঁরা মনুষ্যত্বের বাণী প্রচার করেছেন তাঁদের তত্ত্বকে কি মনুষ্যত্ব নির্ভর সমাজতত্ত্ব বলে আখ্যা দেওয়া যায় না? মনুষ্যত্ব নির্ভর সমাজতত্ত্বের চর্চা ভারতবর্ষের আদি থেকে যে সুরু হয়েছে একথা ভাবাটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না। "অহিংসা পরম ধর্ম" অথবা "সকল জীবে দয়া করা" কিংবা 'তেন্ তক্তেন ভুঞ্জিতা' (ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বিচার করেই কি প্রচারিত হয় নি?

এর পর এলো ভারতবর্ষে এক ঝড়। সেই ঝড়ে রাজতন্ত্রের মুকুট পড়লো খসে। এলো ব্রিটীশ বণিক। অবশেষে "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ডরূপে," শুরু হোল এক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উত্থান পতনের বিচিত্র অধ্যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এক কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল। ব্রিটীশ সরকারের পতাকাতলে ভারতবর্ষের মনুষ্যত্ব নির্ভর ধর্মের পবিত্র ঐতিহ্যের ধারা হারিয়ে ফেলতে বসল তার ভারসাম্য—তার চিন্তাধারা। ভারত বিভাগ এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতবর্ষের সমাজ জীবনকে করে ফেললো পঙ্গু এবং মৃতপ্রায়। আবির্ভূত হলেন রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ সমাজ

সংস্কারকগণ। শুরু হল সমাজ বিশ্লেষণের স্বপক্ষে আর এক নিজস্ব অথচ নতুন চিন্তাধারা যে চিন্তাধারাকে সমাজ সংস্কার সম্পর্কীয় সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ বললে নিশ্চয়ই ভুল হবে না। শুধু দর্শন নির্ভর চিন্তাধারাই নয়—তার সঙ্গে তাঁরা প্রয়োগভিত্তিক কর্মসূচীও গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ সমাজ সংস্কারকগণ যেমন প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজের আচার আচরণ এবং ভাবধারার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন অপর পক্ষে তাঁদের চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন অনেক বেশী। একথা বলা যায় তাঁরা তত্ত্বনির্ভর পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কারও চালু করে ছিলেন। (যেমন ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক বাল্যবিধবা এবং নারীশিক্ষার প্রবর্ত্তন—রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিবারণ ইত্যাদি।) এই সূত্রে মিস্ কোলেটের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি যা তিনি রামমোহন রায় সম্পর্কে বলেছিলেন, "Rammohan Roy stands as a living bridge on which India marches from her incalculable Past to incalculable future". যাই হোক অনেকে হয়ত বলবেন যে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির তখনো প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব ছিল না। সমাজতত্ত্বের যদিও বা সেই অর্থে বিষয়বস্তুর একটা নিজস্ব ভঙ্গীমা আছে এবং সেই অর্থে তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক নন কিন্তু একথা মানতেই হবে যে সমাজের যে কোন সমস্যা পর্যালোচনার মাধ্যমেই সমাজতত্ত্ব বিষয়টি জন্ম নিয়েছে এবং সেই অর্থে তাঁরাও সমাজতাত্ত্বিক। কারণ ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের তাঁরাই ধারক এবং বাহক। উপরোক্ত যুক্তি ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে একমাত্র বেলা দত্তগুপ্তাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং তাঁর মতে ভারতের আধুনিক সমাজতত্ত্ব সেকালের সমাজ পর্যালোচনারই ফসল। অবশ্য একথা বলা যায় যে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির তখনো তেমন কোন চল ছিল না। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এবং ইতিহাসের প্রাধান্য ছিল তুলনায় অনেক বেশী। ইউরোপেও তখন সমাজতত্ত্বের সবে

সূচনা হয়েছে বলা যায়। ১৮৬১ সালে পাদ্রী লঙ্‌ সাহেবই প্রথম সমাজতত্ত্ব বিষয়টির গুরুত্ব ভারতবর্ষে প্রচার করেন। তিনিই প্রথম এই আশা নিয়ে বেথুন সোসাইটির প্রবর্ত্তন করলেন যার মাধ্যমে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি ব্যাপ্তি লাভ করবে। ১৮৬১ সালের ২৬শে এপ্রিল বেথুন সোসাইটির সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের রিপোর্টে তিনি বললেন, "One of the reasons why so little in the way of writing has hitherto been contributed to sociology by educated natives and others, may have been the system of education that has prevailed and is prevailing which cultivates memory to the exclusion of almost every other faculty and particularly the necessary one of observation". তাঁর রিপোর্টের এক স্থানে তিনি আরো বলেছিলেন, "The time is very favourable for Sociological investigation as an educated class of natives is rapidly rising qualified not only to investigate but also to write the results of their investigations." অবশ্য ১৮৬৭ সালে আরও একটি সংস্থা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার নাম ছিল 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'। এই সভায় অবশ্য সমাজতত্ত্ব ছাড়া অপরাপর সমাজবিজ্ঞান যথা আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। মেরি কার্পেন্টার ব্রিটেনের National Association for the Promotion of Social Science in Great Britain-এর সহযোগিতায় এদেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সংস্থার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এই কমিটিতে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুধীজন হলেন বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অ্যাটকিন্‌সন্‌, ফাদার লঙ্‌, প্যারিচাঁদ মিত্র, কেশব সেন প্রমুখ। এই সময়কালে যদিও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণের

দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সমাজ সংস্কারকগণ তবুও সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় আচার আচরণের বিপক্ষে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য কিছু কবি সাহিত্যিক। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাবও বড় কম নয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটির সমাজতত্ত্ব বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির গবেষণা ও আলোচনার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল :

১। হিন্দু সমাজের স্বপক্ষে মনুর চিন্তাধারা ইত্যাদি মনুপ্রবর্ত্তিত সূত্র, প্রাকৃতিক নিয়ম, সমাজপ্রগতি ইত্যাদি মানুষের হিতার্থে কতখানি কার্যকর।

২। ৩৬টি জাতি কিংবা বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার হিন্দুসমাজের গড়নের বৈশিষ্ট্য।

৩। হিন্দুসমাজের উপর মুসলমান এবং ইংরেজ জাতীর প্রভাব।

৪। মনুর সূত্র অগ্রাহ্য করার নিমিত্তে প্রাকৃতিক নিয়ম কতখানি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৫। হিন্দু সমাজের ওপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব।

৬। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সামাজিক প্রভাব।

৭। হিন্দু সমাজের ওপর রেলওয়ের প্রভাব।

৮। উড়িষ্যার হিন্দু সমাজের সঙ্গে বাংলার হিন্দু সমাজের তুলনা।

৯। হিন্দুদের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্ডসাহেবের গবেষণার পর্যালোচনা।

১০। কোলকাতার পুরানো হিন্দু পরিবারের ইতিহাস।

১১। কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কালা আদমিরা পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাদানগুলিকে অনুকরণ করতে শিখলো সেই বিষয়ক পর্যালোচনা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সমাজতাত্ত্বিক নিবন্ধ পরিবেশিত হয়েছিল :

ক) হিন্দু সমাজের কথোপকথনের বিষয়বস্তু

খ) বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সামাজিক প্রভাব।

গ) বাংলার বিবাহ পদ্ধতি

ঘ) সুন্দরবন সম্পর্কিত আলোচনা।

ঙ) ওয়ার্ডের হিন্দুসমাজ সম্পর্কিত আলোচনার ওপর সমালোচনা।
(বেলা দত্তগুপ্তার "Sociology in India", পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯ থেকে সংগৃহীত)

সোমপ্রকাশ কাগজে ভারতবর্ষে ব্রিটীশের গড়ন অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞান সভার প্রবর্ত্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে লেখা হয় :

"যেরূপ রাজনীতি সম্বন্ধে হইতেছে, সমাজেরও সেইরূপ জাতি সাধারণের উন্নতি সাধন চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদিগের উদ্দেশ্য এই দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা ইংলণ্ডের সামাজিক বিজ্ঞান সভার ন্যায় এক সভার মধ্যে মধ্যে দেশের স্থানে স্থানে অধিবেশন হউক……সভ্যগণ সমাজের অবস্থা ও উন্নতির প্রস্তাব ও তৎসম্পাদন চেষ্টা করুন। "ইংলণ্ডীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা" অনেক কাজ করিতেছেন। এদেশেও সে প্রকার না হইবে কেন?" (বেলা দত্তগুপ্তার "Sociology in India" হইতে সংগৃহীত)

ভারতবর্ষে যিনি প্রথম দৃষ্টবাদ প্রবর্ত্তন করেছিলেন তিনি হলেন স্যামুয়েল লব যিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এবং "বাঙ্গালী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে লবের ভাব বিনিময় এবং চিন্তাধারার আদান প্রদান হয়। ১৮৬৭ সালের ৫ই জুন গিরিশচন্দ্রকে লিখিত লবের একটি পত্রে দৃষ্টবাদ সম্পন্ন আলোচনার স্বপক্ষে এক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

"I regard the Philosophy of Comte as one day to

Supersede all others······To Hindus I think, its study would be most valuable, as it would enable them to appreciate correctly the grandeur of their past history, while teaching them the future although built upon the past must derive its stability from elements peculiar to itself". (বেলা দত্তগুপ্তার "Sociology in India" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত) আর যাঁরা দৃষ্টবাদ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র (যিনি কোঁতের "Analytical Geometry" মূল ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন), কৃষ্ণনাথ মুখার্জী, রামকমল ভট্টাচার্য্য, অমৃতলাল রায়, রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (যাঁরা কোলকাতার "পজিটিভিষ্ট ক্লাবের" সক্রিয় সদস্য) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি "জ্ঞান ও কর্ম" গ্রন্থে বলেছিলেন "মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। এই মত প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত কেবল পজিটিভিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা অনুমোদিত নহে,") ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দশমহাবিদ্যা) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাঁর সম্বন্ধে ব্রজেনশীলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

Evidently the views on man and the universe held by thinkers like Mill, Spencer and Darwin have vitally affected Bankim Chandra's interpretation of Hindu religion and Philosophy, but the profoundest influence of all has been that of Auguste Comte whose Positive Polity and Religion unconsciously appear in almost every thing that our author has to say on domestic Social and Political ideas and institution and the creation and

conservation of national life")। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্ব নিবন্ধে যে আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন তা কোঁতের "Religion of Humanity"র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধের এক স্থানে লিখলেন: "বেদান্তের নির্গুন ঈশ্বরে ধর্মসম্যক ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না। কেননা যিনি নির্গুন তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের "একমেবদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে স্পেনসার "Inscrutable power in nature" বলিয়া ঈশ্বর স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরানো ইতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুন ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল। কেননা তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাহাকে "Impersonal God" বলি তাঁহার উপাসনা নিস্ফল, যাঁহাকে "Personal God" বলি তাঁহার উপাসনাই সফল।" (দত্তগুপ্তার "Sociology in India" গ্রন্থের ১৭৬-১৯৩ পৃষ্ঠার বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত)।

বাংলা সমাজবিজ্ঞান সভায় যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ভিত্তিক নিবন্ধ পঠিত হয়েছিল তারই একটি খসরা বেলা দত্তগুপ্তার "Sociology in India" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করে উল্লেখ করলাম:

১। মাননীয় বিচার পতি ফিয়ারের ভাষণ।

২। কানাইলাল দে কর্তৃক লিখিত এবং পঠিত "স্বাস্থ্যের নিয়ম" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক লিখিত এবং পঠিত "বাংলার নারীবৃত্তি" সংক্রান্ত নিবন্ধ।

৪। মৌলবী আবতুল লতিফ কর্তৃক লিখিত এবং পঠিত "বাংলায় মুসলিম শিক্ষা" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

৫। কিশোরী চাঁদ মিত্র কর্তৃক লিখিত এবং পঠিত "হিন্দুদের উৎসব" সংক্রান্ত নিবন্ধ।

৬। জে. বি. নাইট কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "কোলকাতার জীর্ণ বিদ্যালয়" সংক্রান্ত নিবন্ধ।

৭। রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "বাংলার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা এবং প্রতিকার" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

৮। চন্দ্রনাথ বোস্ কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "বাংলার বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার ভবিষ্যত" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

৯। প্যারীমোহন মুখার্জী কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "বাংলার কৃষক" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

১০। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

১১। কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "ভারতবর্ষের নারী উন্নয়ন" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

১২। জেমস্ লঙ্ কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "ভারত ও রাশিয়ার গ্রামীন সম্প্রদায়" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

১৩। জে. জিওঘিগণ কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "ভারতবর্ষের বাস্তুত্যাগী কুলী" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

১৪। মিস্ মেরি কার্পেনটার কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "কারাগারের নিয়মানুবর্তিতা" এবং "শিল্প সম্পর্কিত ও সংস্কার সম্পর্কিত" চিন্তাধারা সংক্রান্ত নিবন্ধ।

১৫। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "গ্রামজীবন" সম্পর্কিত কিছু তথ্য সংক্রান্ত নিবন্ধ।

১৬। রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জী কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "জাতির উৎপত্তি ও উন্মেষ" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

১৭। এইচ, রেভারলি কর্ত্তৃক লিখিত ও পঠিত "রিফরমেটারি স্কুল এবং শিশু অপরাধী" সংক্রান্ত নিবন্ধ।

১৮। কেনেথ ম্যাকলর্ড কর্ত্তৃক লিখিত এবং পঠিত "ভারতবর্ষে আত্মহননের কারণ এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য" সম্পর্কিত নিবন্ধ।

আজকের সমাজতাত্ত্বিকগণ যখন নারী সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তখন বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকগণের চিন্তাধারার উল্লেখ করতে হয় বৈকি। আজকের সমাজতাত্ত্বিকগণ যখন শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বুনো রামনাথ বা বিদ্যাসাগরের মতবাদের উপর নির্ভর করে যুক্তির দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। আজকের সমাজতাত্ত্বিকগণ যখন পল্লীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তখন স্বভাবতই অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' কিংবা গান্ধীর গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পকে স্মরণ করতে হয়। আজকের সমাজতাত্ত্বিকগণ যখন অর্থনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব নিয়ে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিংবা তদানীন্তন রাজা ও সম্রাটের দরবারী লেখকের চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করতে হয়। আজকের সমাজতাত্ত্বিকগণ যখন ধর্মসংক্রান্ত সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তখন রামকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, মহাবীর, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কিংবা বুদ্ধদেবের আলোচনা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত হবার চেষ্টা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার নেপথ্যে রয়েছে এমন কিছু চিন্তাধারার রশদ যা সঠিক অর্থে সমাজতাত্ত্বিক না হলেও সমাজ সম্বন্ধীয় এবং এর উপরই রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের নতুন এক বিজ্ঞান—সমাজতত্ত্ব। ১৯১৪ সালে প্রথম ভারতীয় সরকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ খুলবার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। ১৯১৯ সালে প্যাট্রিক গেডেজকে প্রথম প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করে সমাজতত্ত্ব ও পৌরতত্ত্ব বিভাগটি খোলা হয়। পরবর্ত্তী বছরে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একজন সহকারী অধ্যাপককে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ নিয়োগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মেধাবী এবং পারদর্শী ছাত্রদের অধ্যাপক গেডেজের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশে সমাজতত্ত্ব এবং গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্ঞান লাভের জন্য পাঠানো হবে। তখন গেডেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় বারোজন। গেডেজের অনুমোদন লাভ করেছিলেন, জি. এস. ঘুরিয়ে যিনি তখন সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে সাম্মানিক স্নাতক হয়ে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘুরিয়েকে বিদেশে পাঠানো হোল সমাজতত্ত্ব বিষয়টি শিক্ষালাভের জন্য। তিনি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সে অধ্যাপক ই. জে. আরউইক্ এবং এল. টি. হব্‌হাউসের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আরো যে তুজনের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তাঁরা হলেন ফ্রেডারিক্ লে প্লে এবং ভিক্টর ব্র্যানফোর্ড। ১৯২৩ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ১৯২৪ সালে রীডার এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। পরে রীডার হিসাবে নিযুক্ত হন এন, এ, টুথিস্। তখন আটটি পেপারের মধ্যে চারটি পেপার স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ের ছাত্রদের পড়ানো হ'ত যা ছিল সমাজতত্ত্ব বিষয়ক। অপর চারটি পেপার হয় দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি কিংবা অর্থনীতি বিষয় থেকে নিতে হত। ১৯৪৩ সালে সমাজতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিষয় বলে পরিগণিত হয়। আর্টস বিভাগের যিনি প্রথম ডক্টরেট হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি ছিলেন ঘুরিয়েরেই ছাত্র যিনি বোম্বাই শহরের অস্পৃশ্য শ্রমিকের ওপর গবেষণা করেছিলেন। ১৯২৬ সালে মাত্র ছজন ছাত্রকে সমাজতত্ত্বের পেপার পাঠ্য হিসাবে দেওয়া হয়েছিল যা ১৯৫১ সালে গিয়ে দাড়ায় ৮৪ জন ছাত্রে। পরে ছাত্রসংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রভর্ত্তী বেঁধে দিতে বাধ্য হয়। তাদের নিয়ম ছিল যে প্রতি অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে ১০ জনের বেশী ছাত্র পঠন পাঠন করতে

পারবে না। ১৯৪২ সালে আরো ছজন অধ্যাপককে সমাজতত্ত্ব বিভাগে নিযুক্ত করা হয়। ঘুরিয়ে ১৯৩৪ সালে প্রফেসার হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তখন প্রায় ৫০ জন গবেষক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় এস. ভি. করণদিকারের যিনি "Hindu Exogamy"এর ওপর গবেষণা করেছিলেন। (১৯২৯ সালে প্রকাশিত)

তারপর যে সমস্ত গবেষণা সেই বিভাগ থেকে (১৯৩৪ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যান্ত) সফলতা অর্জন করে সেগুলো হোল : (১) "The Katkaris" (২) "Changing views on marriage and family" (৩) "Hindu Art: Its Social setting." (৪) "Whither woman" (৫) "Hindu social institutions". (৬) 'Marriage and family in Mysore' (৭) "The Farmer, his welfare and wealth." (৮) "The waslis" (৯) "Life in ancient India" (১০) "Life and living in the rural Karnatak." (১১) "Hindu kinship." (১২) "Social background of Indian nationalism." (১৩) "Hindu woman and her future" (১৪) "Society and the visually handicapped" (১৫) "Folk dance of Maharashtra" ইত্যাদি। ঘুরিয়ে তাঁর গ্রন্থ ছাড়াও প্রায় ২০টিরও বেশী গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেছেন। এন. এ. টুথিস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "Vaishnavas of Gujrat"-এর উপর D. Phil ডিগ্রী লাভ করেন। যে দুজন অধ্যাপক পরবর্তীকালে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কে. এম. কাপাদিয়াই পরবর্ত্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছিলেন এবং তাঁর "Hindu kinship" ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হবার প্রায়

দু'এক বৎসর পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগটি খোলা হয়। অবশ্য প্রথম দিকে অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্বের সমন্বয়েই এই বিভাগটি পঠন পাঠনের ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। প্রথমে অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী এবং পরে অধ্যাপক ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখার্জী সমাজতত্ত্বের প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উভয় সমাজতাত্ত্বিকই শুধু লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়েই নয় সমস্ত ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের প্রসার এবং ব্যাপ্তির কর্মযজ্ঞে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে গেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা অপেক্ষা পঠন পাঠনের প্রতি নজর বেশী থাকাতে গবেষণামূলক তত্ত্ব তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে থেকে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি চালু হয় তা নিয়ে এখনো মতভেদ আছে। যাই হোক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দুটি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পেপার পড়ানো হোত। অধ্যাপক বিনয় সরকারই প্রথম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন। তারপর অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী (১৯১৭-২১) অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বেশ কিছুকাল পরে যিনি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স থেকে পঠন পাঠন সমাপ্ত করে পশ্চিমবঙ্গে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির গুরুত্ব প্রচার করতে ব্রতী হন তিনি হলেন অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তা। ভারতবর্ষের আর এক প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক হলেন রামকৃষ্ণ মুখার্জী যিনি বর্তমানে Indian Statistical Institute এর বিজ্ঞানীর পদমর্য্যাদায় ভূষিত এবং যিনি পরিসংখ্যান ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে ভারতবর্ষে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৬৬ সালে পূর্ব ভারতে প্রথম স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্ব পঠন পাঠন শুরু হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ব্বে অবশ্য অর্থনীতি বিভাগে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি একটি পেপার হিসাবে পড়ানো হোত। পরিসংখ্যানবিদ্ ডঃ নন্দী ছিলেন তখন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। পরে ডঃ সমর মিত্র কিছুকালের জন্য কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৬

সালে মাত্র দু'জন ছাত্রীকে নিয়ে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হল। বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অধ্যাপক শান্তি বসু। অতঃপর এলেন ডঃ অলককুমার মজুমদার। ১৯৭১ সালে স্নাতক (সাম্মানিক) পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয়। বর্তমানে সমাজতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন এবং শিক্ষক প্রায় ৮ জন। ১৯৭৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্ব পড়ানো শুরু হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সমন্বিত একটি বিভাগ এবং বিশ্বভারতীতে পল্লীচর্চ্চা কেন্দ্রে গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হলেন ডঃ নীরেন চৌধুরী এবং প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডঃ সুরজিৎ সিংহের পরিশ্রমের ফসল বিশ্বভারতীর পল্লীচর্চ্চা কেন্দ্র। ভারতবর্ষের আর যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ গবেষণা ও পঠন পাঠনের মাধ্যমে এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে সেগুলো হল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, সগর বিশ্ববিদ্যালয়, আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়, উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়, গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ঐতিহ্যের সঙ্গে যাঁদের নাম যুক্ত রয়েছে তাঁরা হলেন এম. এন. শ্রীনিবাস, এস. সি. দুবে, কেওয়াল মতওয়ানি, আন্দ্রে বেতাই, যোগিন্দার সিং ব্রিজরাজ চৌহান, এবং জি. সি. হলেন, ভিক্টর ডি. সুজা, কে ঈশ্বরণ, পি. এইচ. প্রভূ, আই. পি. দেশাই প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা ঐতিহ্যের বার্তাবহ এবং এখনো গবেষণার সাধনায় নিমগ্ন তাঁরা হলেন এ. এম. শা, এ. আর. দেশাই প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক।

রাজস্থান এবং দিল্লীতে সামজতত্ত্বের চর্চা :—

১৯৫৬ সালে উদয়পুরের এম. বি. কলেজে এবং ১৯৫৯ সালে আজমীরের ডি. এ. ভি. কলেজে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর এবং এস. বি. পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন সুরু হয়েছিল। অধ্যাপক বি. আর. চৌহান ছিলেন প্রথম সমাজতাত্ত্বিক যিনি পঠন পাঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। বেওয়ারের এস. ডি কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের (স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে) প্রধান ছিলেন আর. বি. এস টোমার।

১৯৬১ সালে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন সুরু করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন টি. কে. এস. উন্নিথান, ইন্দ্র দেবা এবং যোগিন্দর সিং।

উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের কোর্স চালু করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন অধ্যাপক বি. আর. চৌহান (কার্যকাল ১৯৬৩-৬৭ সাল)। ১৯৬৭ সালে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক ও. পি. শর্মা।

১৯৬৩ সালে যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের প্রথম পঠন পাঠন সুরু হয়েছিল এবং বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন ডঃ এস. কে. শ্রীবাস্তব। ১৯৭০ সালে যোগিন্দার সিং কার্যভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে বিভাগের কাজ চালাচ্ছেন অধ্যাপক এ. কে. শরণ। উপরোক্ত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া "উওমেনস্ ইনস্টিটিউট", বনস্থালী বিদ্যাপীঠ, আর. আর. কলেজ এবং আরও ৩৪টি কলেজে (৯৯টি কলেজের মধ্যে) স্নাতক পর্য্যায়ে বিষয়টি পড়ানো হয়। এ ছাড়া বিদ্যাভবন রুরাল ইনসটিউট, উদয়পুর স্কুল অব সোসাল ওয়ার্ক, রাজস্থান বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও সমাজতত্ত্বের চর্চা সুরু হয়েছে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—

১৯৫৯ সালে প্রথম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন সুরু হয়েছিল এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস। ১৯৬৬ সালে ইউ. জি. সি এই বিভাগকে "Centre of Advanced Study in Sociology"র মর্যাদায় ভূষিত করেছিল।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের "Centre for the Study of Social System" বিভাগটির জন্মকাল ১৯৭১ সাল। ইউ. জি. সি'র রিপোর্টে লেখা হয়, "the programmes of the centre aim at developing a systematic and comparative approach to the analysis of social phenomena." এ ছাড়া দিল্লীর মিরান্দা হাউজ, হিন্দু কলেজ, জেসাস এণ্ড মেরী কলেজ, কমলা নেহেরু কলেজ; মৈত্রেয়ী কলেজ এবং শ্রীভেঙ্কটেশ্বর কলেজে স্নাতক পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি পড়ানো হয়।

উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে সমাজতত্ত্বের প্রসার ঃ—

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব পঠন পাঠনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র। উত্তরপ্রদেশের প্রায় ২৭টি কলেজে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে এবং ১২৭টি কলেজে স্নাতক পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্ব পড়ানো হয়।

মধ্যপ্রদেশে রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎঅনুমোদিত ২৩টি কলেজে, বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎঅনুমোদিত ১৭টি কলেজে, জিয়াজী বিশ্ববিদ্যালয় (গোয়ালিয়র) এবং তৎঅনুমোদিত ১১টি কলেজে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক পর্য্যায়ে বিষয়টির চর্চা পুরোদমে চলছে। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়েও সমাজতত্ত্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিভাগ রয়েছে যেখানে সমাজতত্ত্বের গবেষণা ও চর্চা চলছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যায় সমাজতত্ত্বের চর্চা ঃ—

১৯৫১ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির চর্চা সুরু হয়। ১৯৫১-৫৩ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপক ভি. কে. এন. মেনন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ডঃ এন. প্রসাদ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এবং প্রচেষ্টায় তিনটি কলেজে যথা পাটনা কলেজ, বি. এন, কলেজ এবং মগধ মহিলা কলেজে বিষয়টি স্নাতক পর্য্যায়ে পড়ানো সুরু হয়। ১৯৫৬ সালে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (এ. আর. দেশাই এবং ডঃ এন. কে. শুক্লার তত্ত্বাবধানে), ১৯৭২ সালে এল. এন. মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে (তন্ত্রনাথ ঝাঁ-এর তত্ত্বাবধানে) এবং ১৯৭৪ সালে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টির পঠন পাঠন সুরু হয়। এ ছাড়া রামেন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার ভেটেরনারী কলেজ, বিহার কৃষি কলেজেও সমাজতত্ত্বের চর্চা চলছে।

উয়িড়ষ্যা প্রথম সমাজতত্ত্ব বিষয়টি স্বীকৃতি পায় কেন্দ্রপাড়া

কলেজে। এন. পি. বাহালিয়া ১৯৬৩ সালে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং বিষয়টির চর্চা চালু রাখতে প্রয়াসী হন। ১৯৭০ সালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন পাঠন শুরু হয় উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৩ সালে সমাজতত্ত্ব বিভাগ একটি স্বাধীন বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ডঃ আর. এন. শ্রীবাস্তব হলেন প্রথম বিভাগীয় প্রধান। আসামের শুধুমাত্র ডিব্রুগর বিশ্ববিদ্যালয়েই বিষয়টি পড়ানো হয়। ১৯৬৭ সালে ডঃ নায়ারের তত্ত্বাবধানে বিভাগটি খোলা হয়। ১৯৬৮ সালে ডঃ এস. এম. দুবে বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে সমাজতত্ত্বের চর্চা :—

আমরা আগেই জেনেছি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের চর্চা শুরু করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এ ছাড়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত "Post Graduate Centre, Goa" (পাঁজায় অবস্থিত)-তে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৮ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিষয়টি খোলা হয়। ১৯৪৯ সালে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎ-অনুমোদিত কিছু কলেজে, ১৯৬৮ সালে মারাঠ্যাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎঅনুমোদিত কিছু কলেজে, ১৯৭০-৭১ সালে শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎঅনুমোদিত কিছু কলেজে, ১৯৬৪ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎঅনুমোদিত কিছু কলেজে, ১৯৭০-৭১ সালে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎঅনুমোদিত কিছু কলেজে, ১৯৭০-৭১ সালে বরোদার এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭০-৭১ সালে সরদার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎঅনুমোদিত কিছু কলেজে, ১৯৭০ সালে দক্ষিণ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে (সুরাট) এবং তৎঅনুমোদিত

মাত্র একটি কলেজে, ১৯৭৭-৭৮ সালে সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক পর্যায়ে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির পঠন পাঠন সুরু হয়েছিল।

অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় সমাজতত্ত্বের চর্চা

অন্ধ্রপ্রদেশের অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে; কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মহিসোর বিশ্ববিদ্যালয়ে; তামিলনাড়ুর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাতুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কেরালার কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোচিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিষয়টির পঠন-পাঠন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই চলছে।

এ ছাড়া চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, অমৃতসরের গুরুনানক বিশ্ববিদ্যালয়, লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্বদ্যিালয় এবং হিসারের হরিয়াণা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিষয়টি পড়ানো হয়। একমাত্র জম্মু কাশ্মীর রাজ্যেই বিষয়টির কোন চর্চা নেই।

ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের চর্চা সুরু হওয়ার এত বছর পরেও নিজস্ব কোন চিন্তাধারার অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব এখনও ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করে চলেছে। এই সূত্রে এস. সি. দুবের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, "The growth and development of sociology in India has followed a slow and tortuous path........it appears some kind of luxury or a status symbol........" যাই হোক্

সমাজতত্ত্ব বিষয়টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তারই নেপথ্যে যে সমস্ত চিন্তাধারার প্রাধান্য রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে কতগুলি পর্য্যায়ে ভাগকরা যেতে পারে। যাঁরা এই বিষয়টির নেপথ্যে ছিলেন এবং যাঁদেরকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের এই বিষয়টির জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করা যায় না অথচ যাঁরা সঠিক অর্থে সমাজতাত্ত্বিক নন কিন্তু সমাজবিশ্লেষক তাঁদের চিন্তাধারার উপর আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সূচনা। সেই অর্থে প্রাক্ ১৯১৯ সালের চিন্তাধারাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক) মনুষ্যত্ব সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা।

খ) সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা।

ক) মনুষ্যত্ব সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা :—

ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনিঋষিগণ থেকে শুধু করে রাজতন্ত্রের সময়কালের দরবারী লেখক এবং নবজাগরণের কিছু প্রবক্তার সমাজবিশ্লেষণের নেপথ্যে রয়েছে মনুষ্যত্ব নির্ভর সমাজবিজ্ঞানের এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক 'মান্' এবং 'হুসের' একমাত্র প্রেক্ষাপট হল সৌভ্রাত্র, ভালোবাসা এবং প্রেম যার সঙ্গে এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে আধুনিক লৌকিক সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারার। তবে পার্থক্য হল এই যে লৌকিক সমাজতত্ত্ব মূল্যবোধের উপর নির্ভর করেনি। কিন্তু মনুষ্যত্ব সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব যা ভারতবর্ষে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত দিয়েছে সেখানে মূল্যবোধের আধিক্য বড় বেশী। যে সমস্ত সমাজচিন্তাবিদ্ এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা কেউ দার্শনিক, কেউ রাজনীতিবিদ্, কেউ কবি সাহিত্যিক আবার কেউ বা সমাজ সংস্কারক। এই সূত্রে বুদ্ধদেব, সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শঙ্করাচার্য্য, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে!

খ) সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত চিন্তাধারা :—

নবজাগরণের যুগেই এই ধরণের চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি নির্ভর ধর্মতত্ত্ব এবং মনুষ্যত্ব নির্ভর চিন্তাধারারই এ এক পরিবর্তিত রূপ। দ্বিতীয়তঃ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে ভারতে ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রাধান্য বিস্তারের বিপক্ষে কলম ধরেছিলেন কিছু সমাজ চিন্তাবিদ্। তাঁদের সমাজ সংস্কারমূলক মতবাদ মূলতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করতে এবং এক নতুন সমাজ গঠন করতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় তাঁদের রচনা এবং গবেষণা সঠিক অর্থে সমাজতাত্ত্বিক না হলেও সমাজতত্ত্বমূলক অর্থাৎ তাঁরা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বীজ বপন করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ধারণার সঙ্গে কর্মের, দর্শনের সঙ্গে বাস্তবের এক সেতু নির্মাণ করতেও তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায় সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সংস্কারের এক সমন্বয় তাঁরা ঘটিয়েছিলেন যা সমাজতত্ত্বের জগতে এক নতুন চিন্তাধারা অর্থাৎ সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। যাঁরা এই চিন্তাধারার প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, প্যারিচাঁদ মিত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ঋষি অরবিন্দ, দীনবন্ধু মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জী, মনোমোহন ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র বসু, তারকনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয় দত্ত, দাদাভাই নওরোজী, মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ সমাজ চিন্তাবিদ্।

ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত সমাজতত্ত্ব নিয়ে যা গবেষণা হয়েছে কিংবা হচ্ছে তাতে নিজস্ব কোন চিন্তাধারা এখনো ভারতের সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ায় গড়ে ওঠেনি। তবে গবেষণার ফসলকে

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতবর্ষে দুটি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার অঙ্কুর বিদ্যমান :

ক) দর্শন নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং

খ) প্রয়োগভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

আগেই বলেছি ধর্মের এক পীঠস্থান এই ভারতবর্ষ। প্রাচীন মুণিঋষির ভারত থেকে দর্শনের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই বীজ মধ্যযুগের পর্য্যায়কে অতিক্রম করে আধুনিক যুগের সমাজতাত্ত্বিকের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। আধিভৌতিক তত্ত্ব, আধিদৈবিক তত্ত্ব থেকে সুরু করে আধিবিদ্যক তত্ত্ব এবং সর্বশেষে দৃষ্টবাদ তত্ত্ব দর্শনের আলোকে বিশ্লেষিত হয়। ব্রজেন শীল, রাধাকমল মুখার্জী, ধূর্জটীপ্রসাদ, কেওয়াল মতওয়ানি, পি. এইচ. প্রভূ প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক হ'লেন এই দর্শন নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষক। মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রত্যয় এবং সমাজজীবনে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রতীকের বিন্যাস ও প্রয়োগ নিয়ে যে সমাজতাত্ত্বিক ভারতবর্ষে প্রথম দর্শন-নির্ভর মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন তিনি হলেন রাধাকমল মুখার্জী। তাঁর "Symbolic life of Man" এবং "The Dynamics of Morals" দর্শন-নির্ভর সমাজতত্ত্বেরই ফসল। ধূর্জটীপ্রসাদও বস্তুতান্ত্রিকতার খোলস ছেড়ে রাধাকমল মুখার্জীর মত দর্শন নির্ভর মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন। ভারতের সংস্কৃতি এবং রক্ষনশীল কৃষ্টির ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর গবেষণা ভারতের সমাজতাত্ত্বিক জগতে এক মূল্যবান অবদান।

ব্রজেন শীল, ভূপেন বোস প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদ্ ও ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের মধ্যে এক দর্শনকে চাক্ষুস করেছিলেন যা তারা মনে করতেন পাশ্চাত্য সভ্যতার চাইতে অনেক বেশী উন্নতমানের, অনেক বেশী প্রাঞ্জল। ঘুরিয়ের "The Theory of Knowledge and Values in Indian Society," কে. ইশ্বরণের "Encounter of Cultures," এস. ভি. কেটকারের "An essay of Hinduism,"

কেওয়াল মতওয়ানির "Manu Charma Sastra : A Sociological and Historical Study," ধূর্জটিপ্রসাদের, "Modern Indian Culture : A Sociological Study," পি. এইচ. প্রভুর, "Hindu Social organization," বিনয় সরকারের, "The positive Background of Hindu Sociology," ব্রজেন শীলের, "Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity with an Examination of the Maharastra Legend about Narada's Pilgrimages to Svetadvipa and an Introduction on the Historico-Comparative Method," ইত্যাদি গবেষণামূলক গ্রন্থ দর্শন-নির্ভর সমাজতত্ত্বেরই ফসল।

ভারতবর্ষের আর একদল কৃতী সমাজতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারাকে "প্রয়োগভিত্তিক" প্রত্যয়ের মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছেন। সমাজ পরিবর্তন এবং উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কিত মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁরা বিভিন্ন প্রয়োগভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে ভারতের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন এবং পরিকল্পনাবিদের কাছে এক সুষ্ঠু রূপায়ণের রূপরেখার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

এককাল ছিল যখন মানুষ ছিল অসভ্য বর্বর এবং আদিম। তারপর বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ সভ্য হয়েছে। পুরাতন প্রস্তর যুগের পথ অতিক্রম করে নতুন প্রস্তর যুগকে সাক্ষী রেখে আজ মানুষ পৃথিবীর বিস্ময়। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা থেকে শুরু করে তার আচার আচরণ, বেশভূষা ব্যবহার সব কিছুই বদলেছে। বদলেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। ডিগিংষ্টিক থেকে এসেছে বুলডোজার, গরুরগাড়ী থেকে এসেছে উড়ো জাহাজ, গুহার আস্তানা থেকে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। শিকার, পশুপালন ও কৃষিকার্য থেকে আরম্ভ করে সমাজ শিল্প সভ্যতার পথে

সফল পদক্ষেপ ফেলেছে। শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে যে চতুরবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল তা দৃষ্টবাদ সম্পন্ন সভ্যতার আলোকে অনেক ম্রিয়মান—ম্রিয়মান বর্ণাভিমান, জাত্যাভিমান। তবে ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত ঐতিহ্যও দৃষ্টবাদের কঠোর অনুশাসনে অবলুপ্তির পথে। বিবাহ পদ্ধতির হয়েছে আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তন হয়েছে পরিবারের গঠন এবং প্রকৃতির। গ্রামীণ সভ্যতার ঐতিহ্য নগর সভ্যতার নিয়ন্ত্রণে বদলেছে অনেক। ভারতবর্ষে সমাজ পরিবর্তনের স্বপক্ষে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্বের কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন কিছু সমাজতাত্ত্বিক যাঁরা সমাজ পরিবর্তনকে ইতিহাসের মাপকাঠিতে বিচার করে পর্যালোচনা করেছেন সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। সমাজের যে কোন পরিবর্তনই হল সামাজিক পরিবর্তন। আর একটু ভেঙ্গে বললে বলা যায় সমাজের অর্থনৈতিক, জনসংখ্যান, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিবর্তনকেই সামাজিক পরিবর্তনের আওতায় ফেলা যায়। এই পরিবর্তন প্রতি-নিয়ত চলছে অর্থাৎ সমাজ বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে যেমন তার কাঠামো তেমনি তার কার্যক্রমও। সেই কারণে ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিকদের নজর পড়েছিল পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার দিকে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যান্য দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে কিছুটা স্বতন্ত্র্য কারণ ভারতবর্ষ দুশো বছর ধরে ছিল ব্রিটীশের কাছে শৃঙ্খলিত। তারও আগে রক্ষণশীল এক সমাজ ব্যবস্থার কুসংস্কারের বেড়াজালে সে ছিল বন্দী। ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণ এই বিষয়ের ওপর নজর দিলেন। পর্যালোচনা করলেন ঐতিহ্যের উপর আধুনিকতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়ায় ভারতবর্ষে যে শিল্প জাগরণ হয়েছিল তার ফলে সমাজ কাঠামোতে কি ধরণের প্রভাব পড়ল তাও বিশ্লেষণ করলেন তাঁরা। তৃতীয়ত, বিবাহ, জাতি এবং পরিবার সম্পর্কিত কাঠামো ও কার্যক্রম কিভাবে এবং কেন

বদলাতে শুরু করল সে বিষয়ের ওপরও তাঁরা আলোকপাত করলেন।

যে সমস্ত কৃতী সমাজতাত্ত্বিক সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রয়োগ-ভিত্তিক গবেষণায় নিমগ্ন থেকে ভারতের সমাজতাত্ত্বিক ছুনিয়াকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁরা হ'লেন, এ. আর. দেশাই, (Rural Sociology in India), এম. এন. শ্রীনিবাস (Social Change in Modern India), ব্রজেন শীল (The Theory of Social Change and Development in India), এস. সি. ছবে (Exploration and Management of Change), এম. এস. গোরে (Some Aspects of Social Development), কে. ঈশ্বরণ (Studies in Social Reconstruction and Social Policy), কে. এম. কাপাদিয়া (Industrialization and Rural Society), ধূর্জটীপ্রসাদ (Views and Counter-views), রাধাকমল মুখার্জী (The Land Problems of India), রামকৃষ্ণ মুখার্জী (The Sociologist and Social Change in India Today), এম. এস. রাও (Social Change in Malabar) যোগিন্দার সিং (Modernization of Indian Tradition : A Systematic Study of Social Change) সুরজিৎ সিংহ (Science, Technology and Culture) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক।

যদিও সমাজতাত্ত্বিক ছুনিয়াকে বেশ কয়েক পর্যায়ে সাধারণতঃ ভাগ করা হয়ে থাকে তবুও দুই ধরণের চিন্তাধারার সাপেক্ষেই সমাজতত্ত্বের পরিচয় : ক) কার্যনির্ভর সমাজতত্ত্ব এবং খ) সংঘাত নির্ভর সমাজতত্ত্ব।

যাঁরা সমাজের যে কোন অবস্থা বা ঘটনাকে কার্যের নিমিত্তেই যাচাই করেন তাঁরা অবশ্যই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী নয়। মার্কসের আবির্ভাব এবং তাঁর বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ বিশ্লেষণ যা মূলতঃ

সংগ্রামের স্বপক্ষেই রচিত, সমাজতত্ত্বে এক নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটালো। সমাজের মূলবোধকে কেন্দ্র করে "আছে" এবং "নেই" এর যুদ্ধ যার আর এক নাম শ্রেণী সংগ্রাম এবং যার মাধ্যমে শ্রেণী হীন সমাজের আবির্ভাব ঘটবে—ইতিহাসের এই বস্তুতান্ত্রিক নির্ভর সত্যতা তাঁর অনুগামীদের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত দিয়েছিল। মার্কসীয় দর্শন স্বভাবতই সমাজ সংস্কার বিরোধী এক দর্শন। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রেণী হীন সমাজের উন্মেষ সম্ভব। এই হোল মার্কসীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। স্বভাবতই মার্কসীয় মতবাদ বিপ্লবের সাপেক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কসের তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করলে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সমাজতাত্ত্বিকেরা অগাস্ত কোঁত কিংবা হারবার্ট স্পেনসারের তত্ত্বকে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ বলেই মনে করবে কারণ তাঁদের তত্ত্বে বিপ্লব কিংবা শ্রেণী সংগ্রাম অথবা কোন সংঘাত মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত নেই।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচিত্র। মার্কসীয় দর্শনকে সামনে রেখে বলা যায় ভারতবর্ষেও ক্রীতদাস প্রথা ছিল—ছিল শোষণ এবং অত্যাচার। অবশেষে হল সামন্ততন্ত্রের উন্মেষ। সেখানেও সেই একই চিত্র—সামন্ত প্রভুদের শোষণ এবং অত্যাচার। এলো শিল্প বিপ্লবের ছোয়া—সামন্ত প্রভু পোশাক বদলে হল শিল্পপতি। শোষিত কৃষক হল শোষিত মজুরে রূপান্তরিত। এই যে রাজতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র থেকে ধণতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন প্রভাব সেখানে স্বভাবতই সাম্যবাদের ঢেউ এসে লাগবেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকেরাও যাঁদের মার্কসীয় দর্শন অনুপ্রাণিত করেছে তাঁরা সমাজকে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষাপটে বিচার করছেন—বিশ্লেষণ করছেন—ভারতবর্ষের পটভূমিকায় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখার্জীই ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। যদিও তিনি পুরোপুরি

মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ পর্যালোচনা করেন নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক শক্তিই যা দ্বান্দ্বিকতত্ত্বকে মেনে চলে তাই হোল ভারতবর্ষের কৃষ্টি এবং সমাজগঠনের প্রধান হাতিয়ার। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সম্পর্কে কঠোর পর্যালোচনা করে বলেছিলেন "আমি ক্রমবর্ধমান উন্নতি চাই না—দারিদ্র মোচন চাই—সোজা কথা এই"। অবশ্য শেষ পর্য্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্পর্কিত দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং সেখানেই ছিল মার্কসীয় দর্শন থেকে তাঁর বিচ্যুতি কারণ মার্কসীয় দর্শনে জাতীয়তাবোধের কোন স্থান নেই।

আর যাঁরা মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ও দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন এ. আর. দেশাই, মানবেন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাসবপুন্নাইয়া, মুজফ্‌ফর ডাঙ্গে, রণদিভে, নামবুদ্রিপাদ প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজচিন্তাবিদ্।

নগর সমাজের সমস্যা, গড়ন বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ঢেউ ভারতের সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ায় এখনো তেমন কোন আসন লাভ করতে না পারলেও একদল সমাজ বিজ্ঞানী ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্যাট্রিক গেডেজ হ'লেন ভারতবর্ষে নগর সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর "Town Planning towards City Development : A Report to the Durbar of Indore" পরিকল্পনাবিদ্‌দের কাছে এক মস্ত বড় সম্পদ। সমাজবিজ্ঞানী নির্মল বোসের "Calcutta A Social Survey", আন্দে বেতাইয়ের, "Social Inequality : Selected Reading", ভিক্টর' ডি' সুজা'র "Social Structure of a Planned City—Chandigarh", এম. এস. গোরের "Urbanization and Family Change", কে. ইশ্বরণের "Urban Sociology", ইরাবতী কার্ভের, "The Social Dynamics of a growing Town and Its

surrounding Area", রাধাকমল মুখার্জীর "A City in Transition : A Survey of Social Problems of Lucknow", "Man and His Habitation : A Study in Social Ecology", এম. এস. রাওয়ের, "Urbanization and Social Change", বিনয় সরকারের, "Village and Towns as Social Patterns" নগর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার এক পরিচয় বহন করে যা ভারতবর্ষের নগর সমাজতত্ত্বের ছুনিয়াকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তুলছে।

আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম ভারতবর্ষ। দেশ বলতে শুধু কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড এবং তার সীমানাই বোঝায় না। মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে দেশ কথাটারও অস্তিত্ব থাকতো না। সেই দেশ কতটা এগোলো বলতে বোঝায় সেই অঞ্চলের মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পদ এবং স্বাস্থ্যের সাফল্য। "এগোনো" কথাটার অর্থ হচ্ছে প্রগতি এবং প্রগতি তখনই বোঝা যায় যখন মানুষেরা লেখাপড়া শিখে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, স্বাস্থ্য ভালো রাখার চেষ্টা করে এবং খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার মত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং পটুতা অর্জন করে। এইভাবে সেই অঞ্চলের সমস্ত মানুষেরা যদি নিজেদেরকে বিছায়, জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে তৈরী করে নিতে পারে কিংবা সুযোগ পায় তবেই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব। অজ্ঞতা থেকে আসে কুসংস্কার—কুসংস্কার থেকে আসে ব্যর্থতা। বিভিন্ন বৃত্তিতে দক্ষতা দেখিয়ে নিজেদের ভরনপোষণের জন্য অর্থ রোজগার করাও যেমন লেখাপড়া না শিখলে সম্ভব হয় না, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক মানও নেমে যায় অনেক নীচুতে। সুতরাং অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে—কুসংস্কার থেকে সভ্যতায় এবং দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধিতে উত্তরণের নামই হচ্ছে উন্নয়ন। যাই হোক মানুষই যখন এই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু তখন মানুষ কিভাবে মানুষ হ'ল তার কিছুটা আলোচনা দরকার যাতে মোটামুটি বোঝা যাবে মানুষ কিভাবে উন্নয়নের পথে ধীরে ধীরে

এগিয়েছে। একটা গল্প দিয়েই আমাদের আলোচনা সুরু করা যাক্। প্রখ্যাত গ্রীক নাট্যকার এসকাইলাস্ একটা নাটক লিখেছিলেন। নাটকটির নাম "প্রমিথিউস বন্দী"। নাটকটি যদিও গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী নিয়েই রচিত তবুও একথা তো ঠিক পৌরাণিক কাহিনী যে কোন দেশেরই স্মৃতি কিংবা ঐতিহ্যের বার্তাবহ। যাই হোক গল্পটা হ'ল এইরকম : পৃথিবী সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছিল তাদেরকে বলা হ'ত "টাইটানস্"। এরা সংখ্যায় ছিল মাত্র বারোজন। এদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ ছিল রাজা ক্রোনাস যিনি অগোছাল পৃথিবীকে গুছিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

বাতাস যা মেঘের স্তরের মধ্যে লুকিয়েছিল তা মুক্ত হ'ল—নদী, সমুদ্র বইতে লাগলো তার নিজস্ব খাত বেয়ে—চাঁদ এনে দিল স্নিগ্ধতা—সূর্য্য সময়কে করল দুভাগ—সৃষ্টি হ'ল দিন, সৃষ্টি হ'ল রাত। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে—পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সৃষ্টি হ'ল বিভিন্ন উদ্ভিদ—বিভিন্ন প্রাণী। রাজা ক্রোনাস বসুন্ধরার জন্য এতসব করেও তৃপ্ত হলেন না তিনি প্রমিথিউসকে আরও নতুন কিছু সৃষ্টি করতে আদেশ দিলেন। প্রমিথিউস এক মূর্তি গড়লেন যা হুবহু প্রমিথিউসের মত দেখতে। রাজা ক্রোনাস এই অদ্ভুত মূর্তি দেখে যেমন অবাক হলেন তেমনি খুশীও কম হলেন না। তিনি সেই মূর্তির দেহে জীবনের সঞ্চার করে মর্তে পাঠিয়ে দিলেন। এরাই হ'ল মানুষ। এই মানুষেরা ছিল কিন্তু দুর্বল—অসহায়—এক জড় পদার্থের মত। অলিম্পাসের শাসনকর্তা তখন রাজা জিউস। প্রমিথিউস তাঁরই সৃষ্ট মানুষকে জ্ঞানে বুদ্ধিতে সাহসে সচল করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু রাজা জিউসের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যাইহোক্ প্রমিথিউস অবশেষে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে আসেন। সেই আগুনের স্পর্শে মানুষেরা তেজী হয়ে ওঠে—বিদ্বান হয়ে ওঠে—নিত্য নতুন আবিষ্কার করার প্রতিভা জন্মায় এবং শ্রেষ্ঠ এক জীব বলে পরিচিত হয়। এই হ'ল মানুষ

সৃষ্টির গল্প। যদিও গল্পটা পৌরাণিক এবং যার সঙ্গে মানুষ কি করে শ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিচিত হ'ল সেই সংক্রান্ত কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির সম্পর্ক নেই তবুও দেখা যায় "আগুন" হচ্ছে মানুষের জয়যাত্রার, অগ্রগতির এক প্রতীক যা ছাড়া মানুষের জ্ঞান চেতনা এবং সাহস এবং নতুন কিছু জানবার এবং সৃষ্টি করবার কৌতূহল জন্মাতো না। তাহলে দেখা যাচ্ছে অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা এবং অসহায়তাই হচ্ছে মানুষের এবং দেশের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

এবার যদি বিজ্ঞানের কথায় মানুষের অগ্রগতির ধাপগুলি আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় সেখানেও এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন ছিল যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি অর্থাৎ খাওয়া-পড়া, বাসস্থান এবং যৌন আনন্দ মেটাতে সাহায্য করত। সেই উপাদান-গুলি অবশ্য প্রমিথিউসের মত কেউ মানুষের হাতে তুলে দেয়নি—মানুষ নিজের প্রয়োজনেই তা জোগাড় করেছে এবং বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে। সেই প্রয়োজন মেটাতে মানুষকে সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে—পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে এবং এইভাবেই বানর থেকে যেমন মানুষের রূপান্তর ঘটেছে—তেমনি বর্বরদশা থেকে সভ্য এবং শ্রেষ্ঠ এক জীব বলেও পরিচিত হয়েছে।

মানুষ কি করে মানুষ হ'ল তার যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতে হয় বিবর্তন সুরু হয়েছিল প্রথম অজৈব এক জগতে যেখানে প্রাণী উদ্ভিদ প্রভৃতি কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর এলো জৈব-জগৎ যেখানে প্রাণী এবং উদ্ভিদের সৃষ্টি হ'ল। একেবারে শেষে এলো মানুষ। এ সমস্ত কিছু পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে তো বটেই কিন্তু এই পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে সৃষ্টিও হয়েছে জীবজগৎ গাছপালা ইত্যাদি। জীববিজ্ঞানে এই ধরণের সৃষ্টি এবং বেঁচে থাকবার কৌশলকে বলা হয় অভিযোজন। মানুষের ক্ষেত্রেও এই অভিযোজন শব্দটি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে অভিযোজন হয়েছে দুটি রাস্তা ধরে: ক) দৈহিক

অভিযোজন এবং খ) সামাজিক অভিযোজন। দৈহিক অভিযোজনের কথা বলতে গেলে বানর থেকে মানুষের জৈবিক রূপান্তরের কথা বলতে হয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয় নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন—কেমন করে বানর জাতীয় প্রাণীর মেরুদণ্ড সোজা হ'ল—কেমন করে শরীর থেকে লোম খসে পড়ল—কেমন করে চারিটি পা দুটি হাত এবং দুটি পায়ে রূপান্তরীত হ'ল সে বিষয় নিয়ে বহু আলোচনাও করেছেন। তাছাড়া দৈহিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ বিভিন্ন জায়গা খুড়ে যে পুরোনো কালের কঙ্কাল কিংবা চোয়াল কিংবা মাথার খুলি পাওয়া গেছে তার থেকেও আমরা কিছুটা জানতে পেরেছি।

সামাজিক অভিযোজন বলতে বোঝা যায় সময় এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করবার জন্য প্রচেষ্টা এবং সেই মত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আচার আচরণ। যেমন পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে বনের পশু শিকার করত। কাঁচা মাংস খেত। আগুনের ব্যবহার জানতো না। পোশাক পরিচ্ছদ বলতে তারা গাছের ছাল ব্যবহার করত—গুহায় বাস করত। বিবাহ কিংবা পরিবার বলতে যা বোঝায় তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। শক্তিশালী পুরুষেরই ছিল যৌন আনন্দ মেটাবার অধিকার। তারা ভাষার ব্যবহার জানতো না—জানতো না প্রতীকের ব্যবহার। অবশেষে এলো নতুন প্রস্তর যুগ। দৈহিক আকৃতির যেমন ঘটল পরিবর্তন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠনের কম পরিবর্তন ঘটল না। প্রথম ধাপে মানুষকে বলা হত "হোমো ফেবার" অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার কর্তা মানুষ। তারপর মানুষ যখন প্রতীকের ব্যবহার শিখলো তখন তাকে বলা হ'ল "হোমো সিম্‌বলিকাস্‌"। অতঃপর মানুষ যখন কথা বলতে শিখলো—জ্ঞানে বুদ্ধিতে এবং সাহসে শ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিচিত হ'ল তখন তাকে বলা হল "হোমো সেপিয়েনস্‌" অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষ। তারা আগুনের

ব্যবহার শিখলো—কৃষিকাজ পশুপালন শিখলো—শিখলো কি করে গৃহ নির্মাণ করতে হয়। পরিবারের সৃষ্টি হ'ল। বিবাহ পদ্ধতির হ'ল প্রবর্ত্তন। এককথায় বলা যায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠনই গেল বদলে। উন্নয়নের প্রথম ধাপে পা ফেলল মানুষ।

এই উন্নয়ন কিন্তু আলাদা করে ভাবা কিংবা বোঝা সম্ভব নয়। কোন দেশের কোন যুগের উন্নয়ন অন্য কোন দেশের বা যুগের সঙ্গে তুলনা করেই তা বোঝা সম্ভব। পুরাতন যুগকে সামনে রেখে আমরা নতুন যুগের উন্নয়ন কিংবা অগ্রগতির কথা কিভাবে বুঝতে পারি তা নীচের সারণী থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হবে।

পুরাতন প্রস্তর যুগ	নতুন প্রস্তর যুগ
ক) পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যা কখনোই ঘষেমেজে চকচকে করে তোলা হত না।	ক) ঘষামাজা এবং চকচকে ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র
খ) খাবারদাবার সংগ্রহ করতে হত।	খ) খাবারদাবার উৎপন্ন করত।
গ) শিকার	গ) কৃষিকাজ ও পশুপালন।
ঘ) অবাধ যৌন সম্পর্ক	ঘ) বৈবাহিক সম্পর্ক।
ঙ) আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা	ঙ) আক্রমণ, প্রতিরক্ষা এবং খাদ্যোৎপাদন।
চ) যাযাবর।	চ) বসতি স্থাপন
ছ) বর্বরতা	ছ) সভ্যতা

উপরোক্ত যে কটি বিষয় দেখানো হ'ল তা নিশ্চয়ই উন্নয়ন কিংবা অগ্রগতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। আধুনিক যুগের অগ্রগতির কথা বললে আবার নতুন প্রস্তর যুগের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে হবে। সেখানে দেখা যাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে দিয়েছে অনেক উন্নত পর্য্যায়।

পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের বদলে এসেছে অ্যাটম বোমা—সেকেলের কৃষি পদ্ধতির বদলে প্রবর্তন হয়েছে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃষিকাজ—আবিষ্কার হয়েছে ট্রাকটর, কৃষিপাম্প, নতুন নতুন বীজ, সার এবং কীটনাশক ঔষধ। প্রবর্তন হয়েছে কলকারখানার। গ্রামীন সমাজ নগর সভ্যতায় পরিণত হয়েছে—কৃষি অর্থনীতি শিল্প অর্থনীতিতে রূপান্তরীত হয়েছে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে তা আবার সামাজিক উন্নয়নকেও এগিয়ে নিয়ে গেছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন হ'ল দেশের অগ্রগতির এক মাপকাঠি। এখন প্রশ্ন হ'ল উন্নয়নকে আমরা কি ভাবে যাচাই করবো? কারোর মনে প্রশ্নও জাগতে পারে উন্নয়ন কাকে বলে? উন্নয়ন ব্যাপারটাকে সব সময়ই পেছন দিক থেকে ভাবতে হয় অর্থাৎ কোন কিছুর পরিনতিই হ'ল উন্নয়নের মাপকাঠি। যেমন একটি শিশু যখন বৃদ্ধ হয় তখনই আমরা বুঝতে পারি শিশুর বৃদ্ধি। ঠিক তেমনি যখন কোন দেশের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য যখন দূর হয় তখনই উন্নয়ন ব্যাপারটা আমরা ভাবতে পারি। এক কথায় বলা যায় সমাজ অগ্রগতির পথের বাধাগুলো যখন দূর হয় তখনই সুরু হয় উন্নয়ন। তাহলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা মানেই অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

উন্নয়ন সম্পর্কিত কিছু ভাবনা

অনেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে সামাজিক উন্নয়নের কথা বলতে চান। একথা ঠিক যে অর্থনৈতিক বিকাশই সামাজিক বিকাশকে চিহ্নিত করে। তবে এই যুক্তি সবসময় খাটে না। মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ অনেক সময় অর্থনৈতিক মূল্যবোধকেও অস্বীকার করে কারণ মানুষের আচার আচরণ সবসময়ই অর্থনৈতিক নয় বরঞ্চ সামাজিক সম্পর্কের ওপরই নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা শিল্পায়নকে উন্নয়নের এক চরম ধাপ হিসেবে মনে করি তবে সেই শিল্পায়ন বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাফল্যই বোঝায় না।

সামাজিক অগ্রগতিও শিল্পায়নের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যাঁরা অর্থনীতিবিদ্ তাঁরা প্রধানতঃ যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মূলধন বিনিয়োগ, উচ্চমানের কারিগরী পটুতা যা প্রধানতঃ ব্যাপক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠী, সে সম্পর্কেই আলোচনা করেন। তাঁদের কাছে উন্নয়ন মানে হ'ল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। কিন্তু উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই বোঝায় না। শিল্পায়নের সাথে সামাজিক ধারা এবং অগ্রগতির যোগ অত্যন্ত বেশী। যখন জমিদারপ্রথা ছিল তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কৃষিভিত্তিক। জমিদারপ্রথা বদল হ'ল—এলো শিল্পযুগ। ফলে অর্থনীতিও বদলালো—এলো শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। এটুকু বললেই কি যথেষ্ট? না। কারণ জমিদারপ্রথার সময়কালে যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল তাও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং অগ্রগতির সাথে বদলেছে এবং উন্নতমানের হয়েছে। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ত কোঁত্ এ সম্পর্কে একটি সহজ এবং সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি যদিও উন্নয়ন কথাটি ব্যবহার করেন নি তবুও তাঁর তিনটি সূত্র সমাজ প্রগতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক ধারা কি করে বদলেছে এবং সমাজ ধীরে ধীরে উন্নয়নের পথে কিভাবে পা ফেলেছে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রথমে সমাজ ছিল রাজতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত। জ্ঞানের ব্যাপারটা ছিল হয় পুরোপুরি দৈবিক নয়তো ভৌতিক। কৃষি প্রধান অর্থনীতিরই আধিপত্য ছিল বেশী। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, বণ্টন এবং সঞ্চয়ে পরিবারের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। দ্বিতীয় স্তরে রাজতন্ত্রের হ'ল বিলোপ। আইনশাসিত সমাজের হ'ল প্রবর্ত্তন। দৈবিক কিংবা ভৌতিক জ্ঞান পরিবর্তিত হ'ল আধিবিদ্যক জ্ঞানে। ধর্মযাজকদের হাত থেকে ক্ষমতা এলো অভিজাত নাগরিকের হাতে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি কিছুটা পরিবর্তিত হ'ল—জন্ম হ'ল বণিক শ্রেণীর। অতঃপর এলো শেষ ধাপ। সৃষ্টি হ'ল শিল্পসমাজ। বিজ্ঞান

দখল করে নিল আধিবিদ্যক জ্ঞানের রাজ্য। মানুষ যুক্তি দিয়ে—অঙ্ক কষে—চোখে দেখে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করতে শিখলো সব কিছু। সৃষ্টি হ'ল অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। সৃষ্টি হ'ল কলকারখানা—কারিগরী শিল্পকর্ম। অর্থনীতিও হয়ে উঠলো শিল্পকেন্দ্রিক। সমাজের এই যে উত্তরণ—জ্ঞানের এই যে পরিবর্তন তা নিশ্চয়ই উন্নয়ন কিংবা অগ্রগতিরই ইঙ্গিত দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিল্পায়ন হ'ল উন্নয়নের এক মাপকাঠী এবং সেখানে সামাজিক উন্নয়নের কথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের থেকেও কম ভাবার নয়। একটি যুক্তি আমি তুলে ধরছি তা থেকে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে উঠবে :

কেমন করে জানতে হয়	=	প্রযুক্তিবিদ্যা
কি জানতে হয়	=	বিজ্ঞান
প্রযুক্তিবিদ্যা + বিজ্ঞান	=	মানবজ্ঞান
মানবজ্ঞানের ব্যবহার	=	আবিষ্কার
মানবজ্ঞান + আবিষ্কার	=	শিল্পোন্নয়ন
মানবজ্ঞান + শিল্পোন্নয়ন	=	সামাজিক উন্নয়ন
তাহলে, মানবজ্ঞান + শিল্পোন্নয়ন + সামাজিক উন্নয়ন	=	শিল্পায়ন

এখন দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন বলতে বোঝায় জ্ঞানের উন্মেষ এবং শিল্পায়ন। অজ্ঞতা এবং অশিক্ষা হ'ল অগ্রগতির বাঁধা। এই অজ্ঞতা জীবনের মূল্যবোধকে অন্ধকারে ঢেকে রাখে—মানুষের আচার আচরণ এবং নিজের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে না—সমাজ ও পরিবারে নিজের ভূমিকা কতখানি সেটুকু বোঝাতেও সাহায্য করে না। এমনকি সুখ স্বাচ্ছন্দ কাকে বলে কিংবা জীবনের মূল চাহিদাগুলো কি এবং কিভাবে তা মেটানো যেতে পারে সে সম্বন্ধে কোন অনুভূতিও জাগিয়ে তুলতে পারে না। কিন্তু যখনই অজ্ঞতা দূর হয়—লেখাপড়া করে নিজেকে মানুষ সচেতন করে তোলে

তখন তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও যেমন সজাগ হয় ঠিক তেমনি নিজের ভরনপোষণ, সুখ-দুঃখ কিংবা আশা নিরাশার কথাও ভাবতে বসে। যখনই নিজের প্রয়োজনে মানুষ নিজেকে কাজে লাগায়—বুদ্ধির দ্বারা—কর্মশক্তির দ্বারা এবং নিত্য নতুন সৃষ্টির দ্বারা নিজেকে তৈরী করে তোলে তখনই আসে সমষ্টির কথা। আর যখন সমষ্টির অগ্রগতি একই তালে পা ফেলে এগিয়ে যায় তখন বলতে হয় দেশ এগোচ্ছে অগ্রগতির দিকে। তাহলে উন্নয়ন কিংবা অগ্রগতির অর্থ হচ্ছে জনগণের কল্যাণ কতটা হ'ল—কতলোক অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখলো—কত লোক দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলো তারই এক প্রতিফলন। ব্যাপক অর্থে উন্নয়ন হ'ল মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষকে কতখানি সচল করে তোলা হ'ল—কতখানি কাজে লাগানো হ'ল তারই এক হিসেব নিকেশ। এতো গেল উন্নয়ন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতেরা কিন্তু এই একই কথা বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন উপাদানকে সামনে রেখে আলোচনা করেছেন। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেছেন উন্নয়নকে দেশীয় মাথা পিছু আয় এবং মোট দেশীয় উৎপাদনকে সামনে রেখে বুঝতে হয়। যারা জনসংখ্যানবিদ্‌ তাঁরা বলেছেন যে জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি এবং মোট দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নয়ন বোঝা সম্ভব হয়। যারা সমাজতত্ত্ববিদ্‌ তাঁরা সামজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, মানুষের আচরণবিধি এবং মূল্যবোধের গঠন এবং কার্যকারিতার পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়নকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। গানার মিরডাল্‌ যিনি এক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ এবং যিনি "উন্নয়ন" সম্পর্কে বহু গবেষণা করেছেন তিনি উন্নয়ন বলতে সামাজিক, জনসংখ্যানমূলক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই বুঝিয়েছেন। তবে তিনি প্রত্যেকটি অবস্থার সঙ্গে কারিগরী পটুতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে পিয়ারসন্‌ যিনি আর একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ তাঁর আলোচনা উন্নয়নকে বুঝতে গেলে খুবই

সাহায্য করে এবং দেশের উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে আর কোন অসুবিধাই হয় না। একথা তো ঠিক যে অনগ্রসর দেশেই উন্নয়ন কথাটি শোভা পায় অর্থাৎ যেখানে উন্নয়নের প্রয়োজন সেখানেই উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং সেদিকে নজর রাখা হয়। এখন অনগ্রসর দেশ আমরা বুঝবো কেমন করে? সে দেশ কতটা এগিয়ে কিংবা কতটা পিছিয়ে সে কথা বুঝতে গেলে হয় আরো কোন অনগ্রসর দেশ কিংবা আরো কোন উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে হয়। পিয়ারসন্ জনসংখ্যার সঙ্গে মোট জাতীয় উৎপাদনের তুলনা করে অনগ্রসর দেশের সঙ্গে উন্নত দেশের সেই "তুলনা" তুলনা করে উন্নয়ন কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩৪ শতাংশ জনসংখ্যা হ'ল উন্নত দেশগুলির এবং ৬৬ শতাংশ হ'ল অনগ্রসর দেশগুলির। উন্নত দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদন হল ৪৭.৫ শতাংশ এবং অনগ্রসর দেশের ১২.৫ শতাংশ। এই তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক মান অনেক উন্নত কারণ জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় উৎপাদন্ অনেক বেশী। কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলিতে জাতীয় উৎপাদন যেমন তুলনায় অনেক কম তেমনি জনসংখ্যাও তুলনায় অনেক বেশী। ফলে বিভিন্ন রকম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে অনগ্রসর কিংবা অগ্রসরমান দেশগুলি। এই আলোচনা থেকে তাহলে উন্নয়ন বলতে কি বোঝা যায় এবং উন্নয়ন কেন এবং কোন অবস্থাতে প্রয়োজন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় এবং অনগ্রসর কিংবা অগ্রসরমান দেশগুলিতে উন্নয়নের জন্য কি করা উচিৎ সে সম্বন্ধে একটি পরিস্কার এবং সহজ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন বিশ্বব্যাঙ্কের একদল বিশেষজ্ঞ। কোন দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা মানেই সেই দেশের বিভিন্ন রকম সমস্যা নির্মূল করা এবং তখন স্বভাবতইঃ

উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাহলে কোন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার সেই দেশের মূল সমস্যাগুলি কি? সমস্যা না জানলে উন্নয়ন কখনোই বাস্তবমুখী হতে পারে না। বিশ্বব্যাঙ্ক অগ্রসরমান দেশগুলির যে যে সমস্যার কথা তুলে ধরেছে তা হ'ল (ক) অপুষ্টি; (খ) রোগব্যাধি; (গ) বেকারত্ব; (ঘ) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্য। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করলেই উন্নয়ন বাস্তবমুখী হয়ে উঠতে পারে।

ভারতবর্ষকে বেশ কিছুকাল আগেও এক অনুন্নত দেশ বলা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষ সেই অভিশাপ থেকে কিছুটা মুক্ত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। সে জন্য ভারতবর্ষকে এখন অগ্রসরমান বা উন্নতিশীল দেশের পর্য্যায়ে ফেলা হয়। এখনো ভারতবর্ষ উন্নত দেশগুলোর চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে। যে যে সমস্যা ভারতবর্ষে এখনো রয়েছে তা হ'ল প্রধানতঃ নিরক্ষরতা, অপুষ্টি এবং রোগব্যাধি ও দারিদ্র্য। মানুষের সার্বিক কল্যাণ যদি উন্নয়নের মাপকাঠি হয় তবে মূল সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা দরকার। এই মূল সমস্যাগুলো কিন্তু আজকের সৃষ্ট নয়—এর শিকড় নিহিত রয়েছে পরাধীন ভারতবর্ষের গর্ভে। বিদেশী বণিক যখন প্রথম ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল এবং তারপরই যখন "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল/ পোহালে শর্ব্বরী/রাজদণ্ড রূপে" তখন থেকেই ভারতবর্ষ ধুঁকছে। তারা লুটে নিয়ে গেছে এদেশের সম্পদ—"ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" হয়েছে নিঃস্ব—হয়েছে পরনির্ভরশীল। তদানীন্তন কৃষক যাদের গোলাভরা ছিল ধান—যাদের পুকুরভরা ছিল মাছ—আম কাঁঠালের গন্ধে বিভোর ছিল যে ভারতবর্ষের সুখী মানুষেরা সেই সুখ আর তাদের রইলো না। গ্রামীন ভারতবর্ষের মানুষ লেখাপড়া শিখবার প্রয়োজন বোধ করত না কিংবা যদিও বা কেউ লেখাপড়া শিখতো তা কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে

তো নয়ই বরঞ্চ লেখাপড়া ব্যাপারটা ছিল তখন "আত্মার মুক্তি"। ফলে অজ্ঞতার অন্ধকার মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই সামগ্রিক অজ্ঞতা দেশকে পিছিয়ে দিল তখনই যখন কৃষি অর্থনীতি আধা শিল্প আধা কৃষি অর্থনীতিতে পরিণত হ'ল। বিদেশী শাসক কৃষকদের শোষণ করে নিজেদের স্বার্থ মেটাতে সক্রিয় হয়ে উঠলো। করের বোঝা চাপানো হ'ল কৃষকদের ওপর। রাজস্বের পরিমাণ বাড়তে লাগলো হু হু করে। "নবাব আমলে শেষ বছরে ১৭৬৪-৬৫ সালে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮ লাখ ১৭ হাজার পাউণ্ড; কোম্পানীর আমলের প্রথম বছরে ১৭৬৫-৬৬ তে আদায় হয় ১৪ লাখ ৭০ হাজার পাউণ্ড; ১৭৭১-৭২ সালে আদায় হয় ২৩ লাখ ৪১ হাজার পাউণ্ড; ১৭৭৫-৭৬ সালে আদায় হয় ২৮ লাখ ১৮ হাজার। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ১৭৭৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্ব নির্দিষ্ট হয় ৩৪ লাখ পাউণ্ড।" (আজিকার ভারত, পৃষ্ঠা—১০৬)। শুধু রাজস্ব এবং কর আদায় করেই বিদেশী শাসক থেমে গেলো না—তারা জমিদারদের মালিক করে দিয়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলো। এতে কৃষকদের দুঃখ কষ্টের সীমা বেড়ে গেলো আরো অনেক বেশী। যারা বণিক তারা তাদের বানিজ্য করার সুযোগ পেলো না। বিদেশী বণিকের একচেটিয়া ব্যবসার কাছে তারা হেরে যেতে বাধ্য হ'ল। তখন মাথা পিছু যা উৎপন্ন দ্রব্য ছিল তার মধ্যে প্রায় ২ কোটী ৫০ লক্ষ্য পাউণ্ডই চলে যেতো ইংলণ্ডের সিন্দুকে। ফলে দেশীয় উৎপাদনের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন ছিল তা ভারতে থাকতো না। এর জন্য সৃষ্টি হয়েছিল এক অর্থনৈতিক শূন্যতা যার ফসল হ'ল অবর্ণনীয় দারিদ্র্য। সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছিল এক ডামাডোল। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, সামাজিক আচার আচরণ এবং মূল্যবোধ বিদেশী সভ্যতার চাপে পড়ে এক অনিশ্চিত এবং পিচ্ছিল পথে এগোতে সুরু করেছিল।

ভারতবর্ষের মানুষকে তারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অজ্ঞতার বেড়াজালে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিল কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল "সুজলাং সুফলাং" ভারতের সম্পদ চুরি করা। দাদাভাই নওরোজী বিদেশী শাসনকালে যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর কথা আলোচনা করেছেন সেগুলো হ'ল:

ক) ভারতে ব্রিটীশ শাসন রাজনৈতিক এবং শাসন সম্পর্কিত স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা এনে দিলেও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করেনি।

খ) করের বোঝায় কৃষক এবং সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল।

গ) বিদেশী বণিক ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদকে এমনভাবে নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে ভারতবর্ষের শিল্প গড়ে ওঠার এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মত মূলধন ছিল না বললেই হয়।

ঘ) বিদেশী শাসক রেলওয়ের প্রবর্ত্তন কিংবা সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিল বটে কিন্তু তা শুধুমাত্র তাদের উৎপাদনকে বাড়ানোর জন্য এবং বিদেশী মাল এদেশে আমদানী করার জন্য।

ঙ) কৃষিকাজের জন্য যেটুকু কাঁচা মাল দরকার সেটুকু বাড়ানোর জন্য বিদেশী বণিকের উৎসাহ ছিল বেশী কারণ সেই কাঁচা মাল তাদেরই প্রয়োজন মেটাতো। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরী করার এবং শিল্পের উন্নতির জন্য (পাট শিল্প বাদে) তাদের কোন চেষ্টা কিংবা উৎসাহই ছিল না। এককথায় বলা যায় তারা চেয়েছিল এদেশের সার্বিক উন্নয়নের রাস্তাকে বন্ধ রাখতে কারণ তারা ভেবেছিল ভারতবর্ষ যত বেশী অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অপুষ্টি এবং দারিদ্র্যে জড়িয়ে পড়বে তত বেশী

তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বিদেশী শক্তির ওপর এবং তখন ভারতবর্ষের সম্পদ ইংলণ্ডের সিন্দুকে জমা পড়বে অনেক বেশী। অবশেষে হ'ল দেশ বিভাগ। সুরু হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মনুষ্যত্বের এই অনৈক্য সৃষ্টি ক'রল এক গভীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষত। পরাধীন ভারতবর্ষ একদিন হ'ল স্বাধীন। জাতির জনক মহাত্মাগান্ধী ভারতবর্ষের অগ্রগতির কথা ভেবে ১৩ দফা এক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করলেন। সেই ১৩ দফা কর্মসূচী হ'ল: (১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য; (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন (৩) খাদির প্রচলন; (৪) গ্রামোন্নয়ন (৫) গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প (৬) শিক্ষার সুযোগ; (৭) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা-দান; (৮) রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রবর্তন; (৯) নারীজাতির মুক্তি; (১০) নিজের ভাষার ওপর শ্রদ্ধা; (১১) অর্থ-নৈতিক সমতার দিকে নজর রেখে কাজ করে যাওয়া ইত্যাদি।

এককথায় বলা যায় গান্ধিজী ছিলেন "পূর্ণস্বরাজে" বিশ্বাসী। তিনি বলতেন, "গরীবেরা যেন বুঝতে পারে যে ভারত তাদেরই দেশ এবং সেই দেশকে গড়ে তুলতে তাদের ভূমিকাও কম নয় এবং সেখানে উচ্চ নীচ শ্রেণীর কোন ভেদাভেদ থাকবে না।" কারণ তিনি স্বপ্ন দেখতেন এক সুন্দর সমাজের যা গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বাদ দিয়ে। তাই তিনি বলেছেন,

"অর্থনৈতিক সমতার জন্য কাজ করে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কিছু ধনীক শ্রেণীকে নামিয়ে নিয়ে আসা যাদের কাছে দেশের সম্পদের বেশীর ভাগই পুঁজি রয়েছে এবং কোটী কোটী মানুষকে উঠিয়ে নিয়ে আসা যারা আধ বেলা খেয়ে বেঁচে থাকার নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করে। যতদিন পর্যন্ত ধনী

দরিদ্রের এই প্রভেদ দূর না হচ্ছে ততদিন অহিংস সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। অবশ্য মুক্ত ভারতের সেই সুদিনের আর বেশী দেরী নেই যেদিন গরীবেরা ধনীদের মত একই ক্ষমতা এবং অধিকার ভোগ করবে।"

গান্ধিজীর স্বপ্ন অবশ্য এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। যে পথে তিনি উন্নয়নকে ভেবেছিলেন সে পথের সঠিক নিশানা এখনো আমরা হয় খুঁজে পাইনি নয়তো খুঁজে নেবার চেষ্টা করিনি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রায় ৩২টা বছর কেটে গেছে আজও ভারতবর্ষের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুছে যায়নি—এখনো ২৯ কোটী ম'নুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে—এখনো রোগব্যাধির প্রকোপ থেকে আমরা মুক্ত হইনি—এখনো শিল্প সভ্যতা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি—এখনো কোটী কোটী মানুষ বেকার—রুজী রোজগারের সংস্থান নেই—এখনো লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় গৃহহীন নয়তো ফুটপাতে কিংবা জড়াজীর্ণ বস্তিতে নিম্নস্তরের প্রাণীদের মত জীবনযাপন করছে। এক কথায় বলা যায় ভারতবর্ষ এখনো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার কিংবা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যর্থতার জন্যই ভারতবর্ষ এখনো উন্নয়নশীল এক দেশ।

যাই হোক এই যোজনা কিংবা উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজেও যে সমাজতাত্ত্বিকের এক গুরুদায়িত্ব রয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। যোজনার বিন্যাস কেমন হবে, কেমন করে যোজনা বাস্তবায়িত করে তোলা যায় সে কথার রূপরেখা অঙ্কন করেন সমাজতাত্ত্বিকেরা। প্যাট্রিক গেডেজ প্রথম নগর পরিকল্পনার তত্ত্ব প্রবর্তন করেছিলেন। এম. এস. রাও ("Tradition, Rationality and Change :

Essays on Sociology of Economic Development and Change") এম. এস. গোরে ('Some Aspects of Economic Development') রাধাকমল মুখার্জী ('Social Science and Planning in India'), এস. সি. দুবে (Explorations and Management of change) কে. এম. কাপাদিয়া ('Industrializations and Rural Society'), অম্লান দত্ত ('Strategies of Economic Development'), আর. এন. সাক্সেনা (Sociology and Social Poilcy in India'), বিনয় সরকার ('A Scheme of Economic Development for young India'), রামকৃষ্ণ মুখার্জী ('Family and Planning in India'), আন্দ্রে বেতাই ('Studies in Agrarian Social Structure') প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের প্রগতির পথের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রয়োগ নির্ভর সমাজতত্ত্বের জগতে তা এক সমৃদ্ধশালী ফসল।

পরিশেষে বলি, ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ঐতিহ্য নেই যাঁরা বলেন তাঁরা বিষয়টির ওপর যথাযথ মর্য্যাদা আরোপ করতে চান না। সমাজতত্ত্ব বিষয়টি ভারতবর্ষের এক নিজস্ব ঐতিহ্যের গর্ভেই জন্ম এবং বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তার এক নিজস্ব স্বকীয়তার ওপর নির্ভর করে। পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব তো থাকবেই কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব পাশ্চাত্য দেশের সমাজতত্ত্বেরই এক পরিবর্তিত রূপ।

এই সূত্রে ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জীর একটি উদ্ধৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

'Sociology has a floor and a ceiling like any other Sciences, but its speciality consists in its floor being the ground floor of all types of social disciplines and its ceiling remaining open to the sky."

——::——

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা ঃ

প্যাট্রিক গেডেজ (Patrick Geddes)
(১৮৫৪-১৯৩২)

প্যাট্রিক গেডেজ ১৮৫৪ সালে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পার্থ একাডেমি থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুকাল তিনি ডাণ্ডীর অন্তর্ভূক্ত ইউনিভার্সিটি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে শিক্ষকতা করেছিলেন। প্যাট্রিক গেডেজ প্রথম এডিনবার্গে পৃথিবীর "প্রথম সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাগারের" প্রতিষ্ঠাতা। লণ্ডনে তিনি সমাজতাত্ত্বিক একটি সংস্থারও উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব ও পৌরনীতি বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি মারা যান।

প্যাট্রিক গেডেজ মূলতঃ পৌরতত্ত্ব এবং নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত তত্ত্ব পর্যালোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১। The Evolution of Sex, সহ লেখক হলেন থম্পসন্ এবং জন ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত।

২। City development, ১৯০৪ সালে প্রকাশিত।

৩। Dramatisation of History : A Pageant of Education from Primitive to Celtic Times, ১৯১২ সালে প্রকাশিত।

৪। Cities in Evolution, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত।

৫। The Coming Polity, সহলেখক হলেন ভিক্টর ব্র্যানফোর্ড, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত।

৬। Ideas at war, সহলেখক হলেন স্লেটার এবং গিলবার্ট, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত।

৭। Town Planning Towards City Development : A Report to the Durbar of Indore (২ খণ্ডে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত)

৮। Life : Outlines of general Biology, সহলেখক হলেন থম্পসন্ এবং আর্থার ; ১৯৩১ সালে প্রকাশিত।

উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ :—

১। On the classification of Statistics and its Results, ১৮৮২ সালে এডিনবার্গের রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

২। 'An Analysis of the Principles of Económics', ১৮৮৪ সালে রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

৩। Civics, as Applied Sociology, লণ্ডনের সোসিওলোজিকাল সোসাইটি কর্তৃক ১৯০৫ সালে প্রকাশিত।

৪। A Suggested Plan for a Civic Museum and Its Associated Studies, লণ্ডনের সোসিওলোজিকাল সোসাইটি কর্তৃক ১৯০৭ সালে প্রকাশিত।

১৯০৯ সালে গেডেজ ভারতবর্ষে আসেন এবং কম করে পঞ্চাশটি শহরের ওপর সমীক্ষার কাজ চালিয়ে পরিকল্পনার ছক তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঢাকা, নাগপুর ও ইন্দোর শহরের ওপর সমীক্ষা ও পরিকল্পনা। "His unpublished plans for the Hebrew University of Jerusalem and for Tel Aviv and his remarkable two volume report on Indore (1918) were also completed between 1914 and 1925. The report on Indore contains his exhaustive critical appraisal of the failings and potentialities of the modern University."

অগাস্ত কোঁত ও লে' প্লে'র চিন্তাধারার যৌথ ফসলই ছিল

গেডেজের চিন্তাধারার মূল উৎস। এরিস্‌টটল এবং পরে হারবার্ট স্পেনসারের চিন্তাধারাকে তিনি বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে যে ত্বরান্বিত করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মামফোর্ডের কথায়, "He (Geddes) treated Sociology as a unifying discipline whose main components are geography, economics and anthropology, all taken in their widest human context". বেন্‌থামের মত গেডেজও "Neologims" চয়ন করতে পছন্দ করতেন এবং গেডেজের "geotechnics," "biotechnics" এবং "conurbation" সম্পর্কিত প্রত্যয়গুলি নতুন প্রত্যয় চয়নজনিত প্রচেষ্টারই ফসল।

গেডেজের অবদান

প্যাট্রিক গেডেজ যদিও পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী তবুও ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানীমহল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবক্তা এবং ভারতবর্ষের এক খ্যাতনামা সমাজতাত্ত্বিক। প্যারিসে জীববিদ্যা অধ্যায়ন করার সময় তিনি এডমণ্ড ডেমোলিনসের সাহচর্যে আসেন যিনি প্রথম গেডেজকে ফ্রেডারিক লে প্লের "famille", "travail" এবং "lieu" সংক্রান্ত বৃত্তি ও আঞ্চলিক গবেষণার ভেতর ঠেলে দেন। জীববিদ্যার এই "organism", "function" এবং "environment" সম্পর্কিত তত্ত্ব গেডেজ পরে সমাজতত্ত্বে প্রয়োগ করেন এবং "famille"-র পরিবর্ত্তে তিনি "folk" অথবা "People" নামক প্রত্যয়টির জন্ম দেন। ১৮৭৯ সালে গেডেজ মেক্‌সিকো যান। সেখানে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাস দুয়েকের মত অন্ধত্বের ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ন। তিনি এই দুর্বলতাকে দূর করবার জন্য একটি কাগজের সাহায্যে এক রেখাচিত্র সম্বলিত Notation উদ্ভাবন করেন। ৩৬টি বর্গ সমন্বিত এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে গেডেজ ধারণা, শক্তি, কার্যক্রম, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া

পর্যালোচনা করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বিবাহ করেন এবং এডিনবার্গে বাস করতে সুরু করেন। এখানে এসে তিনি বিভিন্ন রকম দায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং নগর পরিকল্পনার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৯০ সালে তিনি "out look Tower atop castle Hill" কে পৃথিবীর প্রথম সমাজতাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে পরিণত করেন। ১৯০০ সালে গেডেজ তার অন্যতম সহকর্মী ভিক্টর ব্র্যানফোর্ডের সাহায্যে লণ্ডনে "Sociological Society" গড়ে তোলেন এবং নিজেকে পুরোপুরি সমাজতাত্ত্বিক ও নগর পরিকল্পনাবিদ্ করে গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হ'ন। গেডেজের "City Development" (১৯০৪) সম্পর্কিত রিপোর্ট নগরপরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক অন্যতম অবদান। এই রিপোর্টেই তিনি প্রথম "Conservative Surgery" [মামফোর্ডের ভাষায়, "Preserving the Complex historic issue of a city while boldly introducing desirable innovations."] নামক তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। গেডেজ প্রথম এডিনবার্গ শহরের সমীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে নগরপরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পৌর সমীক্ষা করা। শহরকে এই যে সমীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা তা নিঃসন্দেহে গেডেজকে নগরসমাজতাত্ত্বিকের আসনে বসিয়েছে।

প্যাট্রিক গেডেজের সমাজতাত্ত্বিক অবদান মূলতঃ গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। বারনেস গেডেজের চিন্তাধারা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন : "In this study, practice alternated with theoretical development. Second and not less important was his attempt to systematize and order these experiences by creating a framework which would not merely contain his own material but serve equally as a

focus for studies, both generalized and specialized, that might be made by others. He attempted nothing less than the art of ideological cartography. Like the work of the pre-Columbian map-makers, it was to lead to new explorations and conquests in the actual world."

গেডেজের মতানুসারে স্থান, কাজ এবং সম্প্রদায় যদি সমাজের মূল উপাদান বলে চিহ্নিত করা যায় তবে ভূগোল, অর্থনীতি এবং নৃতত্ত্বকে সমাজতত্ত্বের মূল বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু সময় এবং সামাজিক ঐতিহ্যের পুঁজি এই সরল বিশ্লেষণকে পরিবর্তিত করতে পারে। মানব গোষ্ঠী সাধারণতঃ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারে না কিন্তু পরিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করবার শিক্ষা অর্জন করে। অস্ত্রশস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রয়োগজনিত উপাদানের বিকাশের মাধ্যমে এক মুক্ত শক্তির ভাণ্ডার নির্মিত হয় যা শিল্পকলা, ধর্ম এবং চিন্তাশক্তির বিকাশের সহায়ক। এইভাবেই মানবসমাজের রাজনীতি, কৃষ্টি, শিল্পকলা এবং কাজ, সম্প্রদায় ও স্থানের মধ্যে এক সুষ্ঠু সমঝোতা গড়ে ওঠে। "If the Concept of determinism applies usefully to life on the lower level, the Concept of Creative freedom applies to its upper levels."

হল্যাণ্ড ডাচ্‌দের তৈরী করেছিল কিন্তু ডাচ্‌গন্ তাদের প্রযুক্তিকলা এবং জমির পুর্ণগঠনের মাধ্যমে হল্যাণ্ডকেও গড়ে তুলেছিল। "নিরূপনবাদ" এবং "মুক্তইচ্ছা"র মধ্যেকার এই যে আবছা অস্বচ্ছতা তা গেডেজ সমাজতত্ত্বে এবং জীববিদ্যার ক্ষেত্রে অনুমোদন করেন নি। তাঁর মতে জীবন শুধু মাত্র পরিবেশেরই নামান্তর নয়, জীবন হ'ল "a matter of the organism, in insurgent mood, working on the environment." প্রকৃতপক্ষে জীবন

পরোক্ষভাবে পরিবেশকে পরিবর্তিত করে। সমাজকে সৃষ্টিজনিত কর্মপদ্ধতি এবং পছন্দের মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে গেডেজ সমাজের গোষ্ঠীকে দুটি ভাগে যথা "spiritual" এবং "temporal" শক্তিতে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সত্তাতে ভাগ করেছেন। সমাজ দার্শনিক হিসেবে অবশ্য গেডেজ পুরাতন সামাজিক ধারা ও অগাস্ত কোঁতের সামাজিক ধারা সম্পর্কিত তত্ত্বের মধ্যে কিছু দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলেন। "These functional elements—chiefs and people, intellectuals and emotionals—have a way of hardening into Castes. The function becomes isolated and specialized; in the course of transmission it becomes stereotyped, and finally it fails to express its original content." সংক্ষেপে বলা যায় গেডেজ কোঁতের "Static" সমাজের তত্ত্বকে "Dynamic" সমাজের তত্ত্বে রূপান্তরীত করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠীরই নিজস্ব প্রধান, মানুষ, ভাবুক এবং বুদ্ধিজীবীর এক নিজস্ব গোত্র থাকে। এই সূত্রে তিনি "নেতা, কর্মী, শক্তিদাতা এবং উৎসাহদাতার" কথা উল্লেখ করেছেন। গেডেজের ৩৬টি বর্গ সম্বলিত সূত্র সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তুলে ধরবার এক প্রয়াস। কিন্তু তাঁর "Book case diagram" জীববিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের এক ম্যাপ বললে ভুল হবে না যার দ্বারা তিনি জীবন সম্পর্কিত এক ধারণাকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। এই ডায়াগ্রামটি দুটি অংশে বিভক্ত। উপর অংশ গোষ্ঠী সম্পর্কিত তত্ত্বের এবং নীচের অংশ ব্যক্তি সম্পর্কিত তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়। "with respect to time, four vertical Compartments are divided into three sections : at the extreme left, the past; at the extreme right, the future, the future or the possible; and the middle two, the present.

These sections again are divided into the static and the dynamic." জীববিদ্যায় এই সমস্ত বর্গগুলিকে যখন মূল্য দেওয়া যায় তখন যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা হ'ল :

জীবাশ্ম বিজ্ঞান	বিন্যাস তত্ত্ব	পরিবেশ তত্ত্ব	ফাইলোজেনি
ভ্রূবিদ্যা	এনাটমি	শারীর তত্ত্ব	অনটোজেনি

জীববিদ্যা এবং সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই ধরণের সূত্রের পরিচয় মেলে কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গেডেজ দৈহিক কার্যক্রম, কর্মপ্রক্রিয়া এবং পরিবেশ ও সম্প্রদায়, কাজ এবং স্থানের মধ্যে এক সম্পর্ক নিরূপন করবার প্রাক্কালে যে সূত্রটির উল্লেখ করেন তা হ'ল :

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব	জাতিতত্ত্ব	অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান	ইতিহাসের দর্শন
জীবনী	নৃতত্ত্ব	অর্থনীতি (বিস্তারিত)	জীবনী (সমালোচনা-মূলক)

জে. আর্থার থম্‌সনের সঙ্গে লেখা "Biology and Life : out lines of Biology" গ্রন্থে গেডেজ জর্জ সান্ত্যায়ানার ছুটি সূত্রের কথা ('physics' এবং 'dialectics') উল্লেখ করেন। গেডেজ বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ যেমন মেনে নিয়েছিলেন তেমনি কোঁতের তত্ত্ব দ্বারা কম অনুপ্রাণিত হননি। বার্‌নেসের উক্তি উল্লেখ করে বলা যায় :

"As a social philosopher Geddes was against the absolute state and for the functional organizations of cities and regions ; against bureaucracy and militarism and for the voluntary action of groups ; against mass regimentation and for the gradual

leavening of action by education and example; against sessile aristocracies and ignorant democracies and for that aristo—democracy which he saw arising in the Scandinavian Countries............Geddes the social philosopher rounds out the work of Geddes the systematic sociologist·········".

বিনয় কুমার সরকার (Binoy Kumar Sarkar)

(১৮৮৭-১৯৪৯)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী বিনয়কুমার সরকার উত্তরবঙ্গের মালদায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। ১৯০৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯০৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ইতিহাস এবং অর্থনীতিই ছিল তাঁর পড়াশুনার মূল বিষয়। তবে অপরাপর সমাজবিজ্ঞান যথা রাষ্ট্রনীতি, দর্শন এবং সমাজতত্ত্ব নিয়েও তিনি যে ভাবে চর্চা এবং গবেষণা করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। অধ্যাপক সরকার ছিলেন এক জাতীয়তাবাদী দার্শনিক পুরুষ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি "Dawn society"তে যোগদান করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক প্রথম সারির নেতা। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে তিনি State Scholarship প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব-বিবেকানন্দ প্রভৃতি দার্শনিক এবং ধর্মপ্রচারকদের আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যদিও তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত নিজের জীবনেই অনুভব করেছিলেন তবুও তিনি ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন অনেক বেশী। সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে তিনি কোনদিনই সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা করেননি বরঞ্চ তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এক সমাজবিজ্ঞানী। অর্থনীতি সংক্রান্ত তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে তিনি ভারতের অর্থনীতির "Brain drain" নীতিকে সমর্থন করেননি। তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণা ছিল গোঁড়ামি মুক্ত। তিনি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার এবং শিল্পায়নকেই অর্থনৈতিক সাফল্যের

চাবিকাঠী বলে মনে করতেন। শ্রমিক মঙ্গলের স্বার্থে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অত্যন্ত জরুরী এক পদক্ষেপ বলে স্বীকার করেছেন এবং তিনিই প্রথম শ্রমিকদের জন্য সামাজিক বীমা নীতির কথা ঘোষণা করেছিলেন। জাতীয় অর্থনীতির সাফল্যের আর এক চাবিকাঠী হিসেবে অধ্যাপক সরকার গ্রামীণ এবং কুটীর শিল্পের প্রসারের কথারও উল্লেখ করেছিলেন।

অধ্যাপক সরকার ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর অধ্যাপনার মূল বিষয় ছিল সমাজতত্ত্ব। কিছুকাল তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের রেক্টর হিসেবেও কাজ করেছিলেন। মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত তিনি "অতিথি অধ্যাপক" হিসেবে কাজ করার মর্য্যাদা লাভ করেন।

প্রাগে অবস্থিত "Institute International de Sociologie, Institute Oriental"-এর তিনি ছিলেন এক সক্রিয় সদস্য। তাছাড়া রোমের "Comitato Italiano Sulla Popolazione", প্যারিসের "Societe d' Economic Politique" এবং লণ্ডনের "Royal Economic Society"-এরও তিনি সদস্য হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। "American Sociological Review" পত্রিকার তিনি ছিলেন এক সক্রিয় মুখপাত্র। ১৯৪৯ সালে অধ্যাপক সরকার মারা যান।

অধ্যাপক সরকার শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞানের যে কোন একটি বিষয়ের ওপর গবেষণা করেই খ্যাতি লাভ করেন নি। তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ছিল সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। দ্বিতীয়তঃ তাঁর আলোচনা, তত্ত্ব এবং যুক্তি গড়ে উঠেছিল দেশের চরিত্রকে কেন্দ্র করে যদিও বিদেশের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর গবেষণাপ্রসূত চিন্তাধারার এক সমন্বয় ঘটেছিল। তবে অধ্যাপক

সরকার ছিলেন মনে প্রাণে ভারতীয় এক সমাজবিজ্ঞানী। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্বের চর্চা তিনি জীবনের স্বল্প পরিসরে এত বিস্তৃতভাবে করে গেছেন তা ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানের জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যে সব গ্রন্থ প্রনয়ণ করে খ্যাতি লাভ করেছেন সেগুলো হ'ল :

১। "The Science of History and the Hope of Mankind", ১৯১২ সালে রচিত।

২। "Introduction to the Science of Education", ১৯১৩ সালে রচিত।

৩। "Sukranity", ১৯১৩-১৪ সালে রচিত।

৪। "The Positive Background of Hindu Sociology," (৩ খণ্ডে প্রকাশিত) ১৯১৪ সালে রচিত।

৫। "Chinese Religion Through Hindu Eyes", ১৯১৬ সালে রচিত।

৬। "Love in Hindu Literature", ১৯১৬ সালে রচিত।

৭। "The Folk Element in Hindu Culture", ১৯১৭ সালে রচিত।

৮। "Hindu Achievements in Exact Science", ১৯১৮ সালে রচিত।

৯। Hindu Art—Its Humanism and Modernism", ১৯২০ সালে রচিত।

১০। "The Aesthetics of Young India", ১৯২২ সালে রচিত।

১১। "The Futurism of Young Asia", ১৯২২ সালে রচিত।

১২। "The Political Institutions and Theories of the Hindus", ১৯২২ সালে রচিত।

১৩। "Die Lebenschauung des Inders", মূল জার্মানী ভাষায় ১৯২৩ সালে রচিত।

১৪। "Economic Development", ১৯২৬ সালে রচিত।

১৫। "The Politics of Boundaries", ১৯২৬ সালে রচিত।

১৬। "A Scheme of Economic Development for Young India", ১৯২৬ সালে রচিত।

১৭। "Greetings to Young India", ১৯২৭ সালে রচিত।

১৮। "The Political Philosophies Since 1905", ১৯২৮ সালে রচিত।

১৯। "The Pressure of Labour upon Constitution and Law", ১৯২৮ সালে রচিত।

২০। "Comparative Pedagogies in relation to Public Finance", ১৯২৯ সালে রচিত।

২১। "Economic Development", (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৩২ সালে রচিত।

২২। "Comparative Birth, Death and Growth Rates", ১৯৩২ সালে রচিত।

২৩। "Indian Currency and Reserve Bank Problems", ১৯৩৩ সালে রচিত।

২৪। "Imperial Preference vis-a-vis World Economy", ১৯৩৪ সালে রচিত।

২৫। "The Might of Man in the Social Philosophy of Ramakrishna and Vivekananda", ১৯৩৬ সালে রচিত।

২৬। "Social Insurance Legislation and Statistics", ১৯৩৬ সালে রচিত।

২৭। "The Sociology of Population", ১৯৩৬ সালে রচিত।

২৮। "Creative India", ১৯৩৭ সালে রচিত।
২৯। "Introduction to Hindu Positivism", ১৯৩৭ সালে রচিত।
৩০। The Social Philosophy of Masaryk", ১৯৩৭ সালে রচিত।
৩১। "The Sociology of Races, Culture and Human Progress", ১৯৩৯ সালে রচিত।
৩২। "Villages and Towns as Social Patterns", ১৯৪১ সালে রচিত।
৩৩। "Education for Industrialization", ১৯৪৬ সালে রচিত।

অধ্যাপক সরকারের অবদান

অধ্যাপক সরকার ছিলেন মনেপ্রাণে এক জাতীয়তাবাদী সমাজ-বিজ্ঞানী। যদিও তাঁর চিন্তাধারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছিল তবুও একথা ঠিক যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের (সমাজবিজ্ঞান) চিন্তাবিদ্‌গণকে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস থেকে সুরু করে ভবিষ্যতের সমাজগঠনের দিকে নজর রেখেই তিনি সমাজতত্ত্বের চর্চা করে গেছেন। তাঁর "The Positive Background of Hindu Sociology" গ্রন্থটি মূলতঃ শুক্রাচার্য্যের "নীতিসার" বা "শুক্রনীতি"র অনুবাদেরই মুখবন্ধ যা কৌটীল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র মতই এক মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

এই গ্রন্থটিতে অধ্যাপক সরকার ভারতীয় শিল্প এবং কৃষ্টির ঐতিহ্যকে সমাজতত্ত্বের আলোয় যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক জগতে এক মৌলিক চিন্তাধারা হিসাবেই মর্য্যাদা পেয়েছে। কৌটীল্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমালোচনা তিনি এই গ্রন্থটিতে করেছেন তা যেমন "যথাযোগ্য" তেমন "গ্রহণযোগ্য" ও

বটে। অধ্যাপক সরকার কখনোই মনে করতেন না যে হিন্দুধর্ম হ'ল স্বতন্ত্র পার্থিব এক জগৎ। তাঁর সমাজতত্ত্ব চর্চার কৃতিত্ব হ'ল তাঁর বর্তমান এবং অতীতের সামাজিক গঠন এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ণয় করা যা তিনি "The Futurism of Young Asia," "A scheme of Economic Development for young India," "The Might of Man in the Social Philosophy of Ramakrishna and Vivekananda" ইত্যাদি গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মিউনিখের একটি পত্রিকা "Sueddeutsche Monatshefte"-তে তাঁর "The Futurism of Young Asia" গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়:

"এই বইটিতে এশিয়ার আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী নেতাদের ভাবধারা সম্পর্কে এক সুন্দর এবং পরিস্কার চিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে বইটি একটি "গাইডবুক" হিসেবে মনে করা যেতে পারে। যারা এই সমস্যা সম্পর্কে আরো গভীর অনুসন্ধান করতে চান তাঁরা সরকারের দর্শন যা এশিয়ার পুনরাভ্যুত্থানের এক অনুপ্রেরণা সে সম্বন্ধে নিশ্চই অবহিত হবেন।"

এই বইটিতে অধ্যাপক সরকার বলতে চেয়েছেন যে ইউরোপের লেখকগণ ভারতীয় অগ্রগতিকে অনেক ছোট করে দেখেন। বার্লিনের একটি পত্রিকা অধ্যাপক সরকারের ভারতীয় কৃষ্টি এবং সভ্যতা বিশ্লেষণের মেধাকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারকে অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অধ্যাপক সরকারের "Creative India" গ্রন্থটি মূলত: ভারতীয় দর্শন এবং মূল্যবোধ সম্পর্কীয় আলোচনায় আলোকিত হয়েছে। এই বইটিতে অধ্যাপক সরকার ভারতীয় দর্শনের সত্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। ভারতীয় কৃষ্টি এবং দর্শন যে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই—নানান উত্থান পতনের মধ্যে এগিয়ে যাবার যে অঙ্গীকার ভারতবর্ষের মজ্জায় রয়েছে সে কথা তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছেন। প্যারিসের একটি পত্রিকা

"Revue Internationale de Sociologie" বলেছে যে লেখক (অধ্যাপক সরকার) হলেন নবীন ভারতের এক মুখপাত্র। অর্থনীতিবিদ্ এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক সরকার যদিও বিদেশী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তবুও তিনি তাঁর দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভোলেন নি বরঞ্চ কি করে দেশকে আরো উন্নত করা যায় সে চেষ্টাই করেছেন।" "Hydra-headed creative India" যে এশিয়ারই অন্তর্ভুক্ত এবং তার অস্তিত্ব এবং কৃতিত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় যে মোটেই কম নয় সে কথাই তিনি এই বইটিতে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন।

"Die Lebensanschauung Des Inders" যে বইটির ইংরাজী অনুবাদ হ'ল, "Hindu view of life" সে বইটিতেও অধ্যাপক সরকার ভারতীয় বস্তুতান্ত্রিকতা, ভারতীয় দর্শনের গতি-প্রকৃতি, ভারতীয় মূল্যবোধ এবং ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আলোকে পর্যালোচনা করেছেন।

এ ছাড়া তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, হিন্দু সভ্যতা এবং কৃষ্টির নেপথ্যে জনকৃষ্টির অবদান, সাহিত্য-সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব ইত্যাদিও ছিল তাঁর অন্যান্য আলোচনার বিষয়। অধ্যাপক সরকার তাঁর "The Sociology of Population" গ্রন্থটিতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনধারণের মান যে বিশেষ এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে সে কথা অস্বীকার করে সমস্যার জটিলতা নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং ভারতীয় এবং বিশেষ করে বাঙালী সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বুদ্ধিমত্তার কথাও বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্ণ এবং শ্রেণী সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মহার সংক্রান্ত সমস্যা এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অপরাপর প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বইটিতে বিশেষ করে শিল্পায়ন এবং পরিবর্তনীয় শ্রেণী সম্পর্কে এক সুসংবদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গ্রন্থটিকে অনেক উচ্চমানের করে তুলেছে। বর্ণ, জাতি, ধর্ম এবং

ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে যে "জনসংখ্যান বিপ্লবের" কথা অধ্যাপক সরকার আলোচনা করেছেন তা সমাজতত্ত্বের জগতে এক মূল্যবান সংযোজন। এই গ্রন্থটির মূল্য দুটি কারণে অত্যন্ত বেশী। প্রথমতঃ ব্রিটীশ শাসিত ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন সম্পর্কে এক পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কি করে দেশীয় সমস্যার সমাধান করা যায় তার আলোচনা।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জ্জী তাঁর "Sociology of Indian Sociology" (১৯৭৯) গ্রন্থে অধ্যাপক সরকারের মূল্যবোধ সংক্রান্ত মানসিকতা আলোচনা করতে গিয়ে যে উক্তির উল্লেখ করেছেন তাঁর অনুবাদ করলে বলা যায়: "সমাজ মানুষের শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই মানবিক শক্তির বিকাশ উপনিবেশিকতার প্রভাবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত শোষণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।" অধ্যাপক সরকারের সমাজতত্ত্বের চর্চার মূল কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে রামকৃষ্ণ মুখার্জ্জী লিখেছেন, "while the 'might of man' is ultimately dependent on the values projected by a few, it is stabilized, promoted or retarded by the contextual social structure and its function." সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সরকার ইতিহাস, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সামাজিক সংস্থা এবং সংস্কৃতিকে "গঠনমূলক—কার্যকারিতা" নীতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সঙ্গে মানবিক শক্তির অগ্রগতির পদ্ধতির কথাও পর্যালোচনা করেছেন। সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক সরকারের অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জ্জীর উক্তি এই সূত্রে প্রনিধানযোগ্য: "A historico-contemporary-futuristic appraisal of Indian (and Asian) social development, dispelling the notion of the "other worldly" out look of the Orientals and pointing to the need for (a) intensive

empirical research to verify the theoratical formulations and the preliminary emperical findings, and (b) the creation of an extensive data-base."

পরিশেষে বলা যায় অধ্যাপক বিনয় সরকারই একমাত্র ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক যিনি সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে ভারতীয় অগ্রগতি এবং প্রগতির সহায়ক হিসেবে কাজে লাগিয়ে সমাজতত্ত্বের জগতে এক নতুন নজীর সৃষ্টি করে গেছেন। দেশীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে সমাজতত্ত্বের চর্চা করে যে মর্য্যাদা পাওয়া যায় এবং দেশীয় সমাজতত্ত্বের উপাদান যে বিদেশের দরবারে খুঁজতে হয় না তার প্রমাণ অধ্যাপক সরকার যার সম্বন্ধে জন ডিউই এবং এডউইন্ সেলিগ্‌ম্যান বলেছিলেন, "Mr. Sarkar is a distinguished Indian Scholar who has written a number of noteworthy books on both oriental and occidental subjects connected with politics, economics, sociology, education and religion.·········we should unhesitatingly urge the authorities of our educational institutions to afford their students an opportunity of coming into contact with so distinguished a representative of the intellectual life of the orient."

—•—

জি. এস. ঘুরিয়ে (G. S. Ghurye)

ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক জগতে ঘুরিয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ তিনি নৃতত্ত্বেরই ছাত্র ছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে তিনি আজীবন অধ্যাপনা করেন। বর্ত্তমানে তিনি যদিও বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন তবুও সমাজতত্ত্বের সাধনায় এখনো তিনি নিমগ্ন। তাঁর সাধনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে তাঁকে বর্ত্তমানে "এমিরিটাস্ অধ্যাপক" হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

১। Gods and Men, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত।
২। Family And Kin in Indo European Culture, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত।
৩। Cities And Civilization, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত।
৪। Anatomy of A Rururban Community, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত।
৫। The Mahadev Kolis ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত।
৬। Anthropo—Sociological Papers, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত।
৭। The Scheduled Tribes, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত।
৮। Indias Sadhus, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত।
৯। Religious Consciousness, ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত।
১০। Shakespeare on Conscience and Justice, ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত।

১১। Social Tensions in India, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত।

১২। Caste and Race in India, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত।

১৩। Two Brahmonical Institutions, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত।

১৪। I and other Exploration, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত।

১৫। Whither India ? ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

১৬। Agastya and Skanda, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত।

১৭। Vedic India, ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত।

ঘুরিয়ের অবদান ঃ

জি. এস. ঘুরিয়েকে ভারতবর্ষের প্রথম সমাজতাত্ত্বিক বললে বোধহয় ভুল হবে না কারণ ঘুরিয়েই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবক্তা অন্যদিকে প্রয়োগ ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চার মুখ্য বাস্তুকার। ঘুরিয়ের বিষয় ছিল নৃতত্ত্ব এবং সেই কারণেই প্রয়োগভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজতত্ত্বকে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে প্রোথিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। দর্শন নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা কি ভাবে ইতিহাসআশ্রিত সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে সেই দুরূহ চিন্তাধারার ফসল হিসেবে তিনি লিখলেন "Caste and Race in India" যা সি. কে. ওডেনের "History of Civilization Series"য়ে ১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত আমেরিকান জুরি অলিভার ওয়েনডেল্ হলম্সের চিন্তাধারাকে ঘুরিয়ে বোধহয় গ্রহণ করেছিলেন। হলম্স্ বলতেন, "History has to be rewritten because History is the Selection of these threads of Cause or anticedent that we are interested in—and the interest changes in fifty years."

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার মত সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা বোধহয় আর কিছু নেই। ঘুরিয়ের ভাষায়, "A Foreign visitor to India is struck by the phenomenon known as the Caste system." ঘুরিয়ে হিন্দু সমাজের গড়নের পেছনে যে জাতিভেদ প্রথা আছে তার প্রকৃতি আলোচনা কালে ছ রকম পর্য্যায়ের কথা বলেছেন ঃ

1) "Segmental division of Society",
2) "Hierarchy."
3) Restrictions on feeding and Social intercourse",
4) "Civil and religions disabilities and privileges of the different Sections."
5) "Lack of unrestricted choice of occupation",
6) "Restriction on Marriage".

হিন্দু সমাজের প্রাক্ গড়নের কথা যখন তিনি বিশ্লেষণ করলেন তাঁর ইতিহাস নির্ভর চিন্তাধারার ওপর আশ্রয় করে তখন তিনি ভারতের সমগ্র ইতিহাসকে চারটি ভাগে ভাগ করলেন :

"First the vedic period ending about B. C. 600 and comprising the literary data of the vedic "Samhitas" and the "Brahmanas" ; Second, the post-vedic period extending to about the third Century of the christian era.·········the third period may be styled the period of the "Dharmashastras" and ends with the tenth or eleventh Century A. D. Manu, Yajnavalkya and Vishnu are the Chief exponents of the social ideals·······....the fourth period may, with propriety, be called the modern

period, and it brings us down to the beginning of the nineteenth Century." ঘুরিয়ের মতে সমাজইতিহাসের এই শেষ পর্বে এক নতুন ধর্মের উন্মেষ ঘটে যা স্বভাবতই আগের পর্বের চাইতে স্বতন্ত্র। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থের মূল দর্শনকে কেন্দ্রবিন্দু করে ভারতবর্ষের জাতি প্রথার যে দার্শনিক অথচ ইতিহাস নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ঘুরিয়ে করেছেন তার তুলনা হয় না। শুধু এখানেই তিনি শেষ করেননি। তাঁর চিন্তাধারা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে বর্ণের সঙ্গে জাতির দুরূহ আলোচনার ভেতর। ডেনজিল এবং নেসফিল্ডের গবেষণায় ঘুরিয়ে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তিনি লিখলেন, "Both of them, in general, endorse the view that caste is mainly occupational in origin, i. e. occupations which were organized into guilds slowly became exclusive and stratified into Castes."

Nesfield went further and, affirming the essential unity of the Indian race, emphatically denied that racial distinction was the basis of Caste. This extra ordinary statement of Nesfield led Herbert Risley to use anthropometry for a solution of the riddle of caste............"

ভারতবর্ষের জাতিসমূহের বর্ণপ্রকৃতি আলোচনাকালে তিনি মোটামুটি রিসলে'র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বলেছেন : বেলুচিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্য সমূহের তুর্কী-ইরানায়ান প্রজাতির আলোচনা না করাই ভালো কারণ এরা সভ্য ভারতের বাইরের অধিবাসী। কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং রাজপুতানাদের মধ্যে "ইন্দো-এরিয়ান" বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। হিমালয়ের অধিবাসী, নেপালী, অসমীয়া এবং বার্মিজদের মধ্যে "মঙ্গোলয়েড" বর্ণের

পরিচয় পাওয়া যায়। সিংহল থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলসমূহ এবং মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং ছোটোনাগপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে "দ্রাবিদিয়ান" বর্ণের পরিচয় মেলে। বিহারী, সিংহলী প্রভৃতি জাতির মধ্যে "Aryo-Dravidian" বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নবাংলা ও ওড়িষ্যার জাতিসমূহ অনেকাংশে "মঙ্গোলো-দ্রাবিদিয়ান" বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিম ভারতের জাতিসমূহ অনেকাংশে "Scytho-Dravidian" বর্ণের অন্তর্গত। ভারত যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকাতলে তখন জাতিপ্রথার এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঘুরিয়ে লেখেন, "The Policy of Comparative non-interference naturally gave scope for the revolt of the castes........ with the incoming of the modern industrial organization and the growth of Industrial cities, large numbers of peoples congregated in cities of mixed populations, away from the influence of their homes and unobserved by their caste or village people." জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম সরব হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। মনুষ্যত্ব, ঐক্য এবং ভালোবাসার বাণী প্রচার করে যে কোন মানুষকেই ঈশ্বরের ছায়া ভেবে সেবা করার যে মহান ব্রত গান্ধীজী নিয়েছিলেন তা নিশ্চই এক সফল পদক্ষেপ। কিন্তু ঘুরিয়ের মতে, "I envisage the situation and as the analysis of caste under British rule must make it clear, the problem of caste arises mainly out of caste-patriotism. It is the spirit of caste-patriotism which engenders opposition to other castes, and creates an unhealthy atmosphere for the full growth of national consciousness." ঘুরিয়ের মতে, "It is this caste

patriotism that we have to fight against and totally uproot."

ধর্ম সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা আলোচনাও ঘুরিয়ের দার্শনিক চিন্তাধারার আর এক অভিব্যক্তি যা তিনি "Religious Consciousness" গ্রন্থটিতে করেছেন। মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষের ধর্মকে প্রেক্ষাপট ভেবে নিয়ে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত যে দার্শনিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা একাধারে যেমন দর্শন-নিষ্ঠ-সমাজতাত্ত্বিক ফসল, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাস-নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনারও এক সফল পদক্ষেপ। ডোনা জঁ৷ বারডিসের ভাষায়, "As an eminent Sociologist, Anthropologist, and Indologist, Dr. G. S. Ghurye has been concerned with the very foundations of culture, which he categorizes as religious conscionsness, conscience, Justice, free pursuit of knowledge and free expression and toleration........This magnificant book will be heartily welcomed by Sociologists, theologians, philosophers, historians. and many others."

ঘুরিয়ে গ্রামীণ সমাজতত্ত্বের ওপরও গবেষণা করেছিলেন যার ফসল তাঁর "After A Century And A Quarter" গ্রন্থটি। ডঃ চাপেকার এবং ডঃ কুলকার্ণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুণার অন্তর্গত "লোনিকান্দ" গ্রামের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ভারতের গ্রামীণ সমাজের সমস্যা সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ভাবে পর্যালোচনা করেছেন তাতে ভারতের গ্রামীণ সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়া অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব নয়, নগর সমাজতত্ত্ব নিয়েও যে তিনি ভেবেছেন তার প্রমাণ হ'ল ঘুরিয়ের গবেষণাত্মক গ্রন্থ "Anatomy Of A Rururban Community." মারাঠি

রাধাকমল মুখার্জী (Radhakamal Mukherjee)

(১৮৮৯-১৯৬৮)

রাধাকমল মুখার্জী ১৮৮৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ১৯১৭-২১ সাল পর্যন্ত তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহন করেন। শেষ পর্য্যায়ে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবে সম্মানিত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি মারা যান। তাঁর জীবনে তিনি গবেষণার পরিধি যে পরিমাণে বিভিন্ন সমস্যার উপর পরিব্যাপ্ত করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর আজীবন সাধনার ফলশ্রুতি হ'ল প্রায় আঠাশটি গ্রন্থ (নিবন্ধ ছাড়া) যা খুব কম সমাজতাত্ত্বিকই লিখে যেতে পেরেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী :—

১) The Foundation of Indian Economics (১৯১৬ সালে প্রকাশিত)
২) The Principles of Comparative Economics (২ খণ্ডে ১৯২০ সালে প্রকাশিত)
৩) Borderlands of Economics, (১৯২৪ সালে প্রকাশিত)
৪) The Rural Economy of India (১৯২৬ সালে প্রকাশিত)
৫) Regional Sociology, (১৯২৬ সালে প্রকাশিত)
৬) Democracies of the East : A study in Comparative Politics (১৯২৩ সালে প্রকাশিত)
৭) The Land Problem of India (১৯২৭ সালে প্রকাশিত)

৮) The Theory and Art of Mysticism (১৯৩৭ সালে প্রকাশিত)

৯) Food Planning for Four Hundred Millions, (১৯৩৮ সালে প্রকাশিত)

১০) The Institutional Theory of Economics (১৯৪০ সালে প্রকাশিত)

১১) Man and His Habitation : A Study in Social Ecology (১৯৪০ সালে প্রকাশিত)

১২) The Indian working class (১৯৪৫ সালে প্রকাশিত)

১৩) Races, Lands and Food (১৯৪৬ সালে প্রকাশিত)

১৪) The Social Function of Art (১৯৪৮ সালে প্রকাশিত)

১৫) The Social Structure of Values (১৯৪১ সালে প্রকাশিত)

১৬) The Dynamics of Morals : A Socio Psychological Theory of Ethics, (১৯৫০ সালে প্রকাশিত)

১৭) Intercaste Tensions, (১৯৫১ সালে প্রকাশিত)

১৮) A City in Transition : A Survey of Social Problems of Lucknow, (১৯৫২ সালে প্রকাশিত)

১৯) The Philosophy of Social Science (১৯৬০ সালে প্রকাশিত)

২০) The Symbolic Life of Man.

২১) Social Profiles of a Metropolis : A Social and Economic Survey of Lucknow (১৯৬৩ সালে প্রকাশিত)

২২) A District Town in Transition : Social and Economic Survey of Gorakhpur (১৯৬৪ সালে প্রকাশিত)

২৩) The Dimensions Of Value : A Unified Theory (১৯৬৪ সালে প্রকাশিত)

২৪) The Sickness of Civilization (১৯৬৪ সালে প্রকাশিত)

২৫) The Destiny of Civilization (১৯৬৪ সালে প্রকাশিত)

২৬) The Oneness of Mankind (১৯৬৫ সালে প্রকাশিত)

২৭) The way of Humanism : East and West (১৯৬৮ সালে প্রকাশিত)

২৮) Social Sciences and Planning in India (তাঁর মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে প্রকাশিত)

রাধাকমল মুখার্জীর অবদান :—

রাধাকমল মুখার্জী সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছিলেন যা একজন সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। নিম্নলিখিত ক্ষেত্র নিয়েই রাধাকমল মুখার্জী তাঁর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পরিধি পরিব্যপ্ত করেছিলেন :

ক) অর্থনীতি-নির্ভর সমাজতত্ত্ব

খ) আঞ্চলিক সমাজতত্ত্ব

গ) রাষ্ট্রনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব

ঘ) নগর সমাজতত্ত্ব ও পরিবেশ বিজ্ঞান

ঙ) সাহিত্যনিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব

চ) দর্শন নির্ভর সমাজতত্ত্ব

ছ) পরিকল্পনানিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব।

তবে রাধাকমল মুখার্জীর পরিচয় তাঁর দর্শন-নিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব এবং নগর ও পরিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব পরিবেশনায়।

অর্থনৈতিক গড়ন বিশ্লেষণকালে রাধাকমল মুখার্জী বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছেন তবে শ্রেণী সংগ্রামের স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপন করেন নি। তিনি মূলত: আধিবিদ্যক ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সমাজের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে এক দর্শন নির্ভর তত্ত্ব গড়ে তোলেন। এইভাবেই অর্থনৈতিক তত্ত্ব দর্শনতত্ত্বে পরিণত হ'ল। রাধাকমলের ভাষায়, "Man attains complete knowledge and experience through a dialectic of reason and impulse, egoism and communion, intrinsic and instrumental values. All human relations and institutions similarly embody a ceaseless tension and integration of polar and complementary modes of categories. Only through a dialectical movement of such opposite principles and values as freedom and order, stability and change, unity and individuation, instrument and final purpose can human society relate itself to the total universe and ultimate reality, and find a definition of its true meaning and purpose." বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব থেকে দর্শননিষ্ঠ মনোভাবের এই যে উত্তরণ তা মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানীর চোখে নিশ্চই গুরুত্ব পাবে না কিন্তু সমাজতত্ত্বকে ইজমের গণ্ডী থেকে বাদ দিলে বলা যায় রাধাকমলের এই মতবাদ রূপান্তর সম্পর্কিত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষের সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এক সম্পর্ক অনুধাবন করে যে দর্শন রাধাকমল উপলব্ধি

করেছিলেন তা দর্শন নির্ভর সমাজতত্ত্বকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। রাধাকমলের ভাষায়, "……man and nature, freedom and destiny are not separate, and also that intellect and faith, reason and institution should now be restored to their roles for the perception and fusion of inner being with outer reality."

ক্যান্ট্রিল, অলপোর্ট, গার্ডনার, মারফে, স্যামুয়েল হার্ট, পারসনস্, শীলস্ প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা মূল্যবোধ-সংক্রান্ত প্রত্যয় নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। রাধাকমল মুখার্জী সমাজবিজ্ঞানকে এই মূল্যবোধ সম্পর্কিত প্রত্যয়ের আওতার মধ্যে নিয়ে এলেন। ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। রাধাকমল মুখার্জী এই মূল্যবোধ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে লিখলেন, "Its problems are manifold :

1) To deal with values as data of social science for empirical verification….
২) To develop a comparative theory of values dealing with the interrelationships and ranking of values and their institutional patterning.
3) To investigate the enhancement, conflict and reduction of values.
4) To find out alternative values and types of individual and institutional relations.
5) To study social change in relation to tension and maladjustment between persons and values….
6) To distinguish and classify ways of living and types of personality related to mature value

orientations on the basis of the dynamic interchange between personality—values—and Institutions.

7) To find the unity of value system under varied conditions of its genesis and transformation in the evolutionary and cultural history of man."

এই মূল্যবোধজনিত প্রত্যয়কে তিনি প্রয়োগ করলেন "পরিবেশ বিজ্ঞানে" ("Concept of husbandry of natural resources implying the sacrifice of the interests and standard of living of the present generation for the stability and continuity of society") 'অর্থনীতিতে' ("Social welfare, costs and income distribution, fair prices, wages and profits and consumption and living standards"), 'সমাজতত্ত্বে' ("human solidarity, intimacy and morale rising from crowd and interest association through community to commonality") 'রাষ্ট্রনীতিতে' ("power, equality, espirit de corps, loyalty, freedom and regulation") 'আইনশাস্ত্রে' ("liability, equality, liberty, security, rights and order") 'শিক্ষাতত্ত্বে' ("personality growth and expression, mental health, character and goals of life") এবং পারস্পরিক সাহচর্যে, নীতির ক্ষেত্রে এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে।

মূল্যবোধ প্রত্যয় সম্পর্কিত বিশ্লেষণকালে রাধাকমল মুখার্জী যে একটি স্কেলের নমুনা গঠন করেছিলেন তা তুলে ধরছি :—

সমাজবিজ্ঞানে মূল্যবোধ সম্পর্কিত মাত্রা :

ক	খ	গ	ঘ
সমাজবিজ্ঞান	সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যবোধ : আভ্যন্তরীক এবং সাধারণ	প্রতিষ্ঠানজনিত মূল্যবোধ : ব্যবহারিক এবং বিশেষ	মাত্রা নিরূপক সূচক
পরিবেশ বিজ্ঞান	যোগ্যতা এবং সচলতা	সম্পদের ব্যবহার বনাম সংরক্ষণ	জীবনের গড়পড়তা আয়ু
মনস্তত্ত্ব	পরিপূর্ণতা এবং একত্রীভবন	অধিষ্ঠান বনাম মেধার প্রকৃত প্রকৃতি	বুদ্ধিমত্তা,
সমাজতত্ত্ব	নিজস্বতা	সমাজ বনাম সম্প্রদায়	সংযোগ
অর্থনীতি	ব্যক্তি ও সমষ্টির যৌথ চাহিদার তৃপ্তিকল্পে উদ্ভূত "কল্যাণ"	ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বনাম পরিকল্পনা	আয় এবং মূল্যের বণ্টন
রাষ্ট্রনীতি	সমতা	স্বাধীনতা বনাম নিয়ন্ত্রণ	জনগণের মতামতের ঐক্য
আইন	নিরাপত্তা	অধিকার বনাম বিধি	অধিকারের বিচারবোধ।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ : আভ্যন্তরীক এবং আদর্শ		ব্যক্তিগত মূল্যবোধ : ব্যবহারিক
নীতিশাস্ত্র	সততা	আত্মবোধ বনাম আত্মবিমুখতা
শিল্প	সৌন্দর্য্য চরিত্র	আত্ম বিশ্লেষণ বনাম শৃঙ্খলা
ধর্ম	পবিত্র	আত্ম মূল্যায়ণ বনাম আত্ম উত্তরণ

রাধাকমল মুখার্জী 'প্রতীক' সম্পর্কেও দর্শননিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। মানুষকে তিনি বলেছেন প্রতীকনিষ্ঠ এক জীব। "His symbols and principles intermesh with physical objects and processes and the range of his inter-actions, physical and organic, is taken up into the wider, richer and subtler symbolic existence which is the social." সমাজবদ্ধ মানুষের পরিবেশের সঙ্গে প্রতীকী ব্যবহার হ'ল "differentiated and selective."

সংস্কৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও রাধাকমল মুখার্জী মানুষের এই প্রতীকী আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। রাধাকমলের ভাষায়, "the appreciation of the unity and interdependence of symbols and values that comprise the higher, finer and more complex syntheses incorporating typical phases of the lower and that define the structure and integration of personality and social relations ;·········the understanding of the concrete fusion of man's existence with the environment, natural and human, which his meanings, values and symbolic behaviour embody." সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র রাধাকমল মুখার্জী কার্ট লিউইন, ব্রাউন, লুণ্ডবার্গ প্রমুখ সমাজ-বিজ্ঞানীর সঙ্গে নিম্নরূপ মতামত বিশ্লেষণ করেন :

ক) সামাজিক সম্পর্ক আচরণ এবং মূল্যবোধ ক্ষেত্রের গড়নের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়······

খ) সামাজিক অবস্থা হ'ল "দ্বি-মেরু বিশিষ্ট ক্ষেত্র"······

গ) সমাজবিজ্ঞান হ'ল "functional, teleological and symbolic"······

ঘ) সমাজবিজ্ঞানকে পরিবেশতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি,

রাষ্ট্রনীতি, আইনশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়।

ঙ) মানুষ এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক পারস্পরিক সহাবস্থান, আচরণ, সংযোগ, বিনিময়, আইন প্রতিষ্ঠা এবং ঐচ্ছিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়।

চ) প্রতিষ্ঠানমূলক মূল্যবোধ হ'ল যোগ্যতা, সম্পূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা, কল্যাণ, সমতা, নিরাপত্তা এবং সততা।

নগর সমস্যা সম্পর্কিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাধাকমল মুখার্জী ভারতবর্ষে নগর সমাজতত্ত্ব গবেষণার বীজ বপণ করেন। তাঁর "Social Profiles of a Metropolis" গ্রন্থে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের নগর সমস্যা সমীক্ষার মাধ্যমে এত প্রাঞ্জল করে তুলে আলোচনা করেছেন যা নিঃসন্দেহে তাঁকে নগর সমাজতাত্ত্বিকের মর্যাদা দিয়েছে।

সামাজিক পরিবেশতত্ত্ব ভারতবর্ষের নগর সমাজতাত্ত্বিক দুনিয়ার এক নতুন বিজ্ঞান। রাধাকমল মুখার্জী পাশ্চাত্য দেশের মতবাদ থেকে সরে এসে এক নতুন "সামাজিক পরিবেশতত্ত্ব" বিশ্লেষণ করলেন। এলভিন বসককের ভাষায়, "Mukerjee has wisely suggested, relative location or position in the ecological order is comparable (and perhaps some what equivalent) to relative status (i, e. differential opportunities, responsibilities, and rewards) in the social order."

রাধাকমলের, "The social structurc of values" গ্রন্থ সম্পর্কে জন্. ই. ওয়েন মন্তব্য করেন: "The twentieth century lays insistent demands upon both sociology and ethics to think in world terms. In studying the value—premises inherent in the philosophical

mysticism of the East and the scientific rationalism of the west, the sociology of values could make a contribution both to intercultural understanding and to knowledge of the cultural conditions under which a world faith might become an actuality. This is only one instance of the intriguing possibilities that stem from the analysis of the rise, diffusion, conflict, and reconciliation of values. And of the thinkers who have enlarged our conception of the vistas opened by this many-faceted field, none has done so with greater clarity or erudition than Dr. Radhakaml Mukerjee."

রাধাকমলের "The Social Function of Art" গ্রন্থটি প্রাচ্য সংস্কৃতির এক প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। "জার্নাল অব্ ফিলজফি"তে লেখা হয়, "Mukerjee's book is a valuable contribution to the comparative sociology of art. Mukerjee helps us to a better understanding of mankind's legacy of art. Most of all, he enlightens us as to the richness of oriental art in a way unmatched by any European writer where prejudices and predictions for western culture account for a very inadequate appreciation of the artistic heritage of the East." রাধাকমলের দর্শন নির্ভর গবেষণার ফসল "Theory And Art of Mysticism" গ্রন্থ সম্পর্কে "Mind" পত্রিকা মন্তব্য করে : "In view of recent attempts at merely sociological interpretations of religion his treatment of the relation of the social and the religious is distinctly timely."

প্রতীক সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তাধারার ফসল "The symbolie Life of Man" গ্রন্থ সম্পর্কে গার্ডনার মারফে বলেন, "....I

am especially delighted that ideas of bio-social structure and of the symbolic self are woven into cognitive theory and indeed into cosmic theory."

সমাজবিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে তিনি তাঁর "The Philosophy of Social Science (১৯৬০) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "The Philosophy of social science aims at an integration of knowledge about human nature and human destiny. It does not represent a fresh addition to the social sciences, but is concerned with the analysis, description and clarification of the foundation of the existing social sciences. It embodies the corpus of a general or integrated theory of social phenomena..... The philosophy of social science does not accept the dichotomy between science and humanities. It understands and interprets human nature and human history in the light of the manifold aims and goals set forth by the various social sciences and their ordering or hierachy by common life experience and wisdom." এই গ্রন্থটিতে অধ্যাপক মুখার্জী সমাজবিজ্ঞানের দর্শনকে মানুষ ও সমাজের পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত এক গঠন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে সমাজবিজ্ঞানের দর্শনের যৌক্তিকতা ত্বরান্বিত হয় মানুষ, ভাব বিনিময় এবং প্রতিষ্ঠানের অথবা ব্যক্তি, মূল্যবোধ এবং কৃষ্টির এক ত্রিমুখী যোগাযোগের দ্বারা।

এরই ফলশ্রুতি হ'ল ত্রিমুখী সামাজিক অবস্থা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মূল্যবোধ যা শুধু মানুষের আচার আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে মানুষের আচার আচরণের ধারা এবং সামাজিক পদ্ধতির কথাও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এই সূত্রে অধ্যাপক মুখার্জী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কথাও উল্লেখ করেন যা সব জ্ঞান এবং

মূল্যবোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অধ্যাপক মুখার্জীর ভাষায়, "Man thinks and lives dialectically. All social relations and behaviour and the values that lie deep-seated in them embody polar principles and tendencies. Yet neither man nor society are conscious of the dialectical truth of all knowledge, values, human relations and social arrangements and institutions." রাধাকমল মুখার্জীর অন্যান্য প্রত্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল "Acceptance and Transcendence" যা সমাজ দ্বারা পরিচালিত এবং যা মানুষের দ্বৈতসত্তার ইঙ্গিতবহ। বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ এবং মনুষ্যত্বের যে ঐক্য এবং পরিপূর্ণতা সংঘটিত হয় যা ব্যক্ত হয় সংঘাত, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে এবং যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক "মন, সমাজ এবং কৃষ্টির" পরিপূর্ণতা আলোচনা কালে অধ্যাপক মুখার্জী তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "The philosophy of social science accordingly leads the social sciences to the universal insights, experience and values of man, and moulds and shapes one community, one culture, one world, composing the present ideological disparity and struggle among mankind."

"সামাজিক বাস্তবতা"র প্রকৃতি আলোচনা কালে অধ্যাপক মুখার্জী সমাজকে এক ত্রিমুখী ব্যবস্থা বলে বর্ণিত করেন এবং যাকে তিনি এককথায় বলেন "man-in-the community." সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি গণিত নির্ভর পদ্ধতি (পরিসংখ্যান, ইকনমেট্রিকস্, সোসিওমেট্রিকস্) এবং জীববিদ্যা নির্ভর পদ্ধতির (মানুষ এক প্রাণী—কার্যকারিতা—পরিবেশ ; জনগণ—কার্য—স্থান ; কৃষ্টি—পেশা—স্থান) ; কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বিশেষ কোন সামাজিক "ক্ষেত্র", আচার আচরণের প্রকৃতি অথবা আদর্শগত সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানধর্মী যে যে বিষয় গড়ে ওঠে

সে প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ একটি সারণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সমাজবিজ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন। এই সূত্রে তাঁর দেওয়া সারণীটি তুলে ধরছি :

ক	খ	গ	ঘ
বুদ্ধিজীবি মানুষ	আদর্শগত কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক মূল্যবোধ	নিয়মের বস্তুতান্ত্রিক নীতি
পরিবেশজ্ঞানত মানুষ	পারস্পরিক সহাবস্থান	যোগ্যতা	সম্পদের ব্যবহার বনাম সংরক্ষণ
মনস্তাত্ত্বিক মানুষ	আচার আচরণ	পরিপূর্ণতা	অধিষ্ঠান বনাম মেধার প্রকৃত প্রকৃতি
সামাজিক মানুষ	আদান প্রদান	প্রতিষ্ঠা	স্তরবিন্যাস বনাম বিচলন
অর্থনৈতিক মানুষ	বিনিময়	কল্যাণ	প্রতিযোগিতা বনান সমষ্টি
রাজনৈতিক মানুষ	আইনের ব্যবহার	সমতা	স্বাধীনতা বনাম নিয়ন্ত্রণ
আইন সম্পর্কিত মানুষ	আইনজনিত সম্পর্ক	নিরাপত্তা	অধিকার বনাম শৃঙ্খলা
নৈতিক মানুষ	ইচ্ছাকৃত পারস্পরিক সম্পর্ক	সততা	সুখ বনাম আত্ম শুদ্ধি
সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান বিষয়ক মানুষ	আত্ম কল্পনা-জনিত প্রবণতা	সৌন্দর্য্য	আত্ম বিশ্লেষণ বনাম শৃঙ্খলা
ধার্মিক মানুষ	সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান	পবিত্রতা	আত্ম মূল্যায়ণ বনাম আত্ম উত্তরণ

উপরোক্ত সারণী থেকে অধ্যাপক মুখার্জীর মূল্যবোধ সম্পর্কিত তত্ত্ব যে কতটা প্রাধান্য পেয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এই মূল্যবোধকে তিনি বলেছেন, "value, for the philosophy of social

science, represent stable, standardised and hierarchical goals in social living........".

মূল্যবোধের সঙ্গে অধ্যাপক মুখার্জী যোজনার এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ বিশ্লেষণ করেছেন। এই সূত্রে তিনি বলেছেন, "1) Planning, in the first place, is the theory of integrated levels of organisation, of the co-ordination of a society into a higher and more complex unity which denotes a superior quality of living. All planning is value planning. 2) Planning in the second place is the theory of social optima at different levels or realms of social adaptation."

অধ্যাপক মুখার্জীর মূল্যবোধ সংক্রান্ত তত্ত্ব সম্পর্কে বিদেশী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ যে মন্তব্য করেছেন তা ভারতবর্ষের নিজস্ব সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে যে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমোরী বোগারডাস্ বলেন, "While many sociologists have written about social values, Radhakamal Mukherjee has gone further than most of his contemporaries in orienting the subject of values within a general theory of society. This treatment of Mukherjee's system of social thought emphasises the contributions of an outstanding oriental sociologist and social philosopher. The discussion of social values by Mukherjee represents to a notable degree a social system that is not only representative of both East and West, but that is the result of an integration of Eastern and Western social thought

viewed in the light of an over-all cosmic order." ই. এস্. ব্রাইটম্যানের ভাষায়, "Radhakamal Mukerjee is a genuine forntiersman, Inter-relations, border-lands, frontiers are, so to speak, his native habitat............ All Sociologists and all Philosophers are profoundly indebted to Professor Mukerjee for his rich and inspiring insights into human society which transcend the frontiers of all sciences in the interest of the richest possible understanding of society and values in their broadest religious and philosophical significance."

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জী তাঁর "Sociology of Indian Sociology" (১৯৭৯) গ্রন্থে অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জীর মূল্যবোধ সম্পর্কিত তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে রাধাকমল মুখার্জী মনে করতেন মানুষের বিকাশ মুক্ত সমাজের সহযোগিতা এবং সমতার মাধ্যমেই সম্ভব—সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নয়। সমাজতত্ত্বে অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জীর অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জীর মন্তব্য: "Theoretical formulations about the role and structure of values in all societal manifestations; a methodology for an integrated social science approach to social reality; and the creation of a data-base concerning historical and contemporary perspectives on Indian Society."

—•—

ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জী (Dhurjati Prasad Mukherjee)

(১৮৯৪—১৯৬১)

ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বারাসত গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল এবং হেয়ার স্কুলে শিক্ষা লাভের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনার কাজ করেন। অবশেষে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে সম্মানিত হন। ১৯৬১ সালে তিনি মারা যান। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জীর মত ধূর্জটী প্রসাদও ছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক চিন্তাধারার এক অগ্রণী প্রবক্তা। শুধু সমাজতত্ত্বেই নয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর যথেষ্ট পরিমাণ দখল ছিল। সাহিত্য এবং সঙ্গীতের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং অনুরাগী। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি সুন্দরের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। শোনা যায় সঙ্গীত শুনতে শুনতেই তিনি মৃত্যুর কোলে মাথা রেখেছিলেন। সুন্দরের এই একনিষ্ঠ পূজারী ধূর্জটী প্রসাদ কাব্যের মত সমাজতত্ত্বকে সুসংহত এবং পরিমার্জিত করে তুলেছিলেন। তাঁর কাব্যময় সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার একটি অভিব্যক্তি এই প্রসঙ্গে না উল্লেখ করে পারছি না। সমাজতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"Sociology has a floor and a ceiling like any other sciences but its speciality consists in its floor being the ground floor of all types of social disciplines, and its ceiling remaining open to the sky". ধূর্জটী প্রসাদ

সমাজতত্ত্বকে বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১) Personality and the Social Sciences, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত।

২) Basic Concepts of Sociology. ১৯৫২ সালে প্রকাশিত।

৩) Modern Indian Culture, A Sociological Study, (১৯৪২ সালে প্রকাশিত)

৪) Tagore—A Study, ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত

৫) On Indian History, A Study in Method (১৯৪৫ সালে প্রকাশিত)

৬) Indian Music, An Introduction (১৯৪৫ সালে প্রকাশিত)

৭) Views and Counterviews (১৯৪৬ সালে প্রকাশিত)

৮) Problems of Indian Youths (১৯৪৬ সালে প্রকাশিত)

৯) Diversities, Essays in Economics, Sociology and other Social Problems (১৯৫৮ সালে প্রকাশিত)

১০) Anjali (সম্পাদিত) ১৯৪০ সালে প্রকাশিত।

ধূর্জটী প্রসাদের অবদান :

সাহিত্যকে সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবার কৃতিত্ব সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে যিনি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জী। সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সমাজ এ কথা যদি সর্বজনস্বীকৃত হয় তবে বলা যায় যে প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই সামাজিক বিশ্লেষণকে গল্প, কবিতা কিংবা শিল্পকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। তবে যাঁরা সাহিত্যকে সমাজের গঠনবৈশিষ্ট্য

এবং পরিবর্তন নিরূপক এক মাধ্যম মনে করে নিরলস সাহিত্য-শিল্পকর্ম আরাধনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন ম্যাক্সিম গোর্কী, দস্তয়েভস্কি, আন্তন চেখভ্, বারটোল্ড ব্রেক্ট্, লিও তলস্তয়, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী সাহিত্যিক। লেনিনের কথায়, "যে শিল্পোত্তীর্ণ রচনাবলির মর্ম জনগন উপলব্ধি করবে, তারা তা পড়বে, যখন তারা জমিদার আর পুঁজিপতিদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে নিজেদের জন্য সৃষ্টি করবে জীবনের মনুষ্যোচিত পরিবেশ, এমন রচনাবলি তলস্তয় সৃষ্টি করেছেন শুধু তাই নয়; বর্তমান ব্যবস্থায় অত্যাচারিত বিপুল জনগণের নানা মেজাজও তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাদের অবস্থা চিত্রিত করতে এবং তাদের প্রতিবাদ আর ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে পেরেছেন। তলস্তয় মুখ্যত ১৮৬১-১৯০৪ সালের যুগের মানুষ, তদনুসারে, শিল্পী হিসেবে এবং চিন্তাবীর আর প্রচারক হিসেবেও তিনি নিজ রচনাবলিতে সমগ্র প্রথম রুশ বিপ্লবের বিশেষ-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে, বিপ্লবের শক্তিটা আর দুর্বলতাটাকে রূপদান করেছেন বিস্ময়কর বলিষ্ঠ রেখায়।" অনেকটা মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ধূর্জটীপ্রসাদও সাহিত্যের মধ্যে সমাজ বিশ্লেষণের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর যে কতখানি ছিল তার প্রমাণ "Tagore's Letters" নামক একটি নিবন্ধ। এই নিবন্ধে তিনি লিখলেন,"........Nearly all the travel-epistles are evaluating in tone. The poet learns the best in foreign cultures and simultaneously appraises them. English customs, French manners, Japanese dance, Persian national endeavours, Russian collective farms and enterprises—the inwardness of all is intuitively comprehended alongwith their deficiencies........

Tagore's travel-diaries were also letters. They betray a mind that is willing to accept and to reject on the basis of a standard, which is Indian culture as he would like it to be in the light of its ancient heritage and modern contacts." উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় ধূর্জটীপ্রসাদ কতখানি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির ওপর আস্থাশীল ছিলেন। সাহিত্য কতখানি সমাজের গড়ন-বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে সে সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য হ'ল :

"In the days of conformity exegesis is the order ; when values are being revaluated, letters (of literary minded people) release the surplus irresponsible energies involved in experiments and creation. Poetic tradition was being recast as a back-wash of the French Revolution, when that supremely isolated individual, Keats, was privately maturing ; ......D. H. Lawrence could not accept the mechanical and sophisticated civilisation of the day and scattered pell mell the seeds of new life. Even the delicate, shy, Katherine Mansfield gave...... the minute reactions of her extraordinarily sensitive mind.

India, too, has her reputed critical phases. In Bengal, the transformation of values was brisk. Nor was there any dearth of keen minds to realise what was happening." এ তো গেল তাঁর সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক উপলব্ধি বোধের কথা। ধূর্জটীপ্রসাদ

যতই সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার সাধনায় নিমগ্ন থাকুন না কেন ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে তিনি একজন সার্থক সমাজতাত্ত্বিক। তাঁর "Basic Concepts of Sociology" গ্রন্থে তিনি সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে ভারতবর্ষের পটভূমিকায় এবং ভারতবর্ষের প্রকৃতি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং তিনি যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়েছিলেন তার মূল সুর ছিল বিদেশী প্রভাব মুক্ত এক স্ব-দেশীয় কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সমাজতত্ত্ব। ব্রিটিশের শাসন ভারতকে এমন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল যেখান থেকে উঠে আসার ক্ষমতা ছিল খুবই কম। ধূর্জটীপ্রসাদ ভারতবর্ষের এই অনিশ্চয়তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ভারতবর্ষের গড়ন ব্যবস্থা ও বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার অবতারণা করলেন এবং এখানেই ধূর্জটীপ্রসাদের ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে কৃতিত্ব। পূর্বেই বলেছি ধূর্জটীপ্রসাদ ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত এক সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি যখন তাঁর চিন্তার জগতকে উন্মোচিত করেছিলেন তখন বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষেই ছিল তাঁর রায় অর্থাৎ তিনি অর্থনীতির মাধ্যমেই সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিলেন যাকে আমরা মার্কসের দুনিয়া বলেই অভিহিত করতে পারি। কিন্তু ধূর্জটীপ্রসাদের স্বদেশ-প্রেম এমন এক ক্ষেত্রে এসে উপনীত হয় যেখানে তিনি এক জাতীয়তাবাদী সমাজতাত্ত্বিক বলে পরিচিত হ'ন। ভারতবর্ষের কৃষ্টি, দর্শন এবং ঐতিহ্যকেই তিনি সমাজ পরিবর্তনের মূল কেন্দ্রবিন্দু মনে করে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ পর্যালোচনা করেন এবং এখানেই ধূর্জটীপ্রসাদের দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব এবং যার পরিণতি হ'ল মার্কসীয় দর্শন থেকে অ-মার্কসীয় দর্শনে রূপান্তর। তবুও একথা ঠিক যে ধূর্জটীপ্রসাদ প্রথম মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এক সমাজতাত্ত্বিক যিনি ভারতের মাটিতে অর্থনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন যদিও শেষের দিকে তিনি রক্ষণশীলতাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন।

অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা যে মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তা হ'ল, "মানুষের বিকাশ সামাজিক ক্ষেত্র দ্বারাই সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণেই দেশীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং শ্রেণীদ্বন্দের সংকল্প মানুষের বিকাশের সহায়ক কিন্তু পুরোপুরি সহায়ক নয়।" তাঁর মতে সামাজিক বাস্তবতাকে বলা যায় 'special traditions........special symbols······special patterns of culture and social actions."

অধ্যাপক মুখার্জীর তত্ত্ব হ'ল ভারতবর্ষের সামাজিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুতান্ত্রিক মতবাদভিত্তিক ব্যক্তিত্ব এবং কৃষ্টির বিশ্লেষণ। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জীর ভাষায় অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখার্জীর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা ছিল :

"Theoretical formulations about the role of 'tradition' in order to analyse social change, and a historico-contemporary-futuristic appraisal of Indian society, her classes and culture, pointing to the need for empirical research in a comprehensive manner and irrespective of disciplinary boundaries in social science."

—:—

সপ্তম অধ্যায়

ভারতবর্ষের কিছু সমাজতাত্ত্বিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ব্রজেন শীল (Brajen Seal)

১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলতঃ ছিলেন একজন দার্শনিক এবং অপরপক্ষে একজন প্রশাসক। ১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক সমাজতত্ত্বে'র ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ব্রজেন শীলের পিতা ছিলেন অগাস্ত কোঁতের অনুরক্ত। ব্রজেন শীলও ছিলেন রামমোহন রায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহ্যেরই পৃষ্ঠপোষক। ১৯১১ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত "First Universal Races Congress" শীর্ষক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং "জাতির উৎপত্তি" এবং দৃষ্টবাদনীতি এবং প্রাচীন হিন্দুদের "Physico-Chemical" তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনিই প্রথম সমাজবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের ব্যবহার বিধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রজেন শীলই প্রথম প্রশান্ত মহলনাবীশকে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে কৃতী এক বৈজ্ঞানিক হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। ব্যবহারিক দর্শনকে সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে উন্মোচিত করে ব্রজেন শীল যে স্বকীয়তার ছাপ রেখে গেছেন ভারতের সমাজ-তত্ত্বের ইতিহাসে তা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ১৯৩৮ সালে তিনি মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী :—

১) Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity with an Examination of the Mahabharata legend about Narada's Pilgrimage to Svetadvipa and an Introduction on the Historico-Comparative Method, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত।

২) "New Essays in Criticism", ১৯০৩ সালে প্রকাশিত।

৩) Race Origins : Fundamental Considerations Touching the Physical Basis of Race, ১৯১১ সালে প্রকাশিত।

৪) The Quest Eternal, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :

১) সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২) জাতির উৎপত্তি এবং সমস্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব।

৩) পরিসংখ্যানের মাধ্যমে গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞানের চর্চা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (Bhupendra Nath Dutta)

ভারতবর্ষে যারা সমাজতত্ত্ব বিষয়টির প্রবক্তা তাঁদের নামের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখ না করলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আজকের মানুষের কাছে হয়ত তেমন ভাবে পরিচিত নন যেমন ভাবে পরিচিত তাঁর দাদা নরেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিবেকানন্দ। কিন্তু যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন—যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন কিংবা যাঁরা সাম্যবাদের পথিকৃৎ এবং বার্তাবহ তাঁদের কাছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক চিরস্মরণীয় নাম। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে এবং ভারততত্ত্ব বিষয়ে পারদর্শীতা লাভ করে ভূপেন দত্ত নিজেকে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করেন। বিবেকানন্দ যে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সেই মুক্তির দর্শনকে সাম্যবাদের মূলনীতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯০৫-০৯ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলনে ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে ভূপেন্দ্রনাথের মনে তখন স্বদেশপ্রেমের এক অনুভূতি সজাগ হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার প্রতীজ্ঞা নেন। ইংরাজ সরকার স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র-স্বরূপ যে সমস্ত পত্রিকা অর্থাৎ "সন্ধ্যা," "যুগান্তর" ইত্যাদি প্রকাশিত হ'ত সেগুলো বন্ধ করে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তরুন ভূপেন্দ্রনাথ সেই সংকটময় মুহূর্তে "যুগান্তর" পত্রিকা সম্পাদনার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং কারারুদ্ধ হ'ন। যদিও তিনি স্বদেশীকতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তবুও তিনি সমাজ বিশ্লেষণের স্বপক্ষে নিজেকে বিচার করতেন। যে মূহুর্তে তিনি দেখলেন দারিদ্র্য, শোষন এবং অত্যাচারের এক নির্মম সমাজচিত্র, তিনি বুঝলেন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া অগ্রগতির আর কোন

পথ নেই। তখন থেকেই তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এক সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হবার গৌরব অর্জন করতে প্রয়াসী হলেন। বিদেশ থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন সত্যি কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমিকতা এবং রাজনীতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁকে ইউরোপেও টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বার্লিনে গিয়ে তিনি আরও জ্ঞান অর্জন করলেন এবং মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য সুধীজনের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের যোগাযোগ ঘটল। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর কিছু বার্লিনের বন্ধুর সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে যান এবং সেখানে তিনি মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন কলকাতায় "The Society of the Friends of the Soviet Union" (FSU) স্থাপিত হয় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেই সংস্থার প্রথম সভাপতি হবার মর্য্যাদা লাভ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে পুরোপুরি দেশীয় কায়দায় এবং দেশীয় বিশ্লেষণের মাপকাঠীতে বিচার করে চর্চা সুরু করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতের মুক্তি। কিন্তু তিনি "মুক্তি" বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুক্তির কথাই বলেন নি—তিনি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপক্ষেই সমাজতত্ত্বের চর্চা করে গেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বহু নিবন্ধ এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন যা হয়ত আধুনিক সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে তেমন ভাবে উল্লেখিত হয়নি কিন্তু তাঁর "Studies in Indian Social Polity" ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান যাকে অস্বীকার করলে সমাজতত্ত্বের এক প্রখ্যাত প্রবক্তাকে অমর্য্যাদা করা হবে। এই গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মার্কস এবং হেবারের ভারতীয় সমাজের ওপর আলোচনাকে যেভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবী রাখে। মূল্যবোধ সংক্রান্ত মানসীকতা আলোচনাকালে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের চিন্তাধারাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হ'ল "Socialism is to

be estalished by the resolution of contradictions in Society, especially the class contradictions, and in the subjugated countries by the resolution of the colonial contradiction as the initial step."

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের তত্ত্ব যে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ছিল তা' হল ভারতীয় সামাজিক চিত্র মার্কসীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং হেবারের "মানুষের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব এবং ভূমিকা" সম্পর্কিত দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মুখার্জী বলেন যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গবেষণা কেন্দ্রিভূত হয়েছিল "Marxist dialectical approach to explain the evolution of India's social and political structure"—এর ওপর। ফলে সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান হ'ল মার্কসীয় দর্শনের আলোকে সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব নির্ণয় করা। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মুখার্জী বলেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "constructed a preliminary historical data-base from which to proceed with empirical research on the evolution of India's social and political structure."

——::——

কেওয়াল মতওয়ানি (Kewal Motwani)

১৮৯৯ সালে পূর্ব্বে ভারতের কিন্তু বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধ্ জেলার আরাজি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেন যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য ছিলেন।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। নিউ টাইমস্ পত্রিকাতে তিনি কিছুকাল সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। কিছুকাল তিনি করাচী মিউনিসিপ্যালিটির মেয়রও ছিলেন। দু বছরের জন্য তিনি সিন্ধ্ সরকারের অধীনস্থ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার উপর বক্তৃতার দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তিনিই ছিলেন চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা। অবশেষে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। 'The Journal of Sociology'র তিনিই ছিলেন সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা।

গ্রন্থপঞ্জী :—

১। Manu charma sastra : A Sociological and Historical study.
২। Sociological Paper and Essays.
৩। India : A conflict of cultures.
৪। India : A synthesis of cultures.
৫। Universities of the future of India.

৬। Science and society in India.

৭। Sri Arobinda on social sciences and Humanities.

৮। Sociology : A comparative outline.

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। দর্শন নির্ভর সমাজতত্ত্ব।

২। ভারতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য নির্ভর সমালোচনা।

—০—

এম. এন. শ্রীনিবাস (M. N. Srinivas)

এম, এন, শ্রীনিবাস মহীশুর, বোম্বাই (১৯৩৬-৪৪) এবং অক্সফোর্ড (১৯৪৫-৪৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৪৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন। অতঃপর ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বরোদার এম, এস, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাইমন্ সিনিয়র রিসার্চ ফেলো' হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি 'রকফেলার ফেলো' হিসাবে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকায় অতিবাহিত করেন। শ্রীনিবাস গ্রেট্‌ব্রিটেন এবং 'আয়ারল্যাণ্ডের' 'রয়্যাল অ্যানথ্রোপোলোজিকাল ইনস্‌টিটিউট' কর্তৃক 'রিভারস্

মেমোরিয়াল পদক" লাভ করেন। কিছুকাল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে শ্রীনিবাস কাজ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি বাঙ্গালোরের "ইন্সটিটিউট অব সোস্যাল এণ্ড ইকনমিক্ চেঞ্জ" এর অধিকর্তা। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১) Marriage and Family in Mysore.
২) Religion and Society among the Coorgs of South India.
৩) Caste in modern India and Essays.
৪) Social change in Modern India.
৫) The Remembered Village

এছাড়া যে সমস্ত গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন সেগুলি হল :

১) Method in Social Anthropology.
২) Selected Essays by A. R. Radcliffe Brown.
৩) India's Villages

অধ্যাপক শ্রীনিবাস মূলতঃ "পরিবর্তন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব" নিয়েই আলোচনা করেছেন বেশী। ভারতবর্ষের পটভূমিকায় সমাজ পরিবর্তনের ধারা, বিন্যাস, উপাদান এবং হেতু পর্যালোচনা করাই ছিল তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য। এই সূত্রে শ্রীনিবাস প্রবর্তিত "Sanskritization" ধারণাটি বিশ্বের সমাজতত্ত্বের ভাণ্ডারে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। মানুষেরা যে সুযোগ সুবিধা এবং পদাধিকারের মর্য্যাদা পায় তা নিম্নকুলের মানুষেরা যখন অর্জন করতে চেষ্টা করে সেই অবস্থাকেই 'Sanskritization' বলে শ্রীনিবাস ব্যাখ্যা করেছেন। তার দ্বিতীয় ধারণাটি হল 'westernization' যেখানে তিনি ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজ পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের জাতিপ্রথা নিয়ে যেভাবে সুসংহত এবং সুবিন্যস্ত এক আলোচনা করেছেন সমাজতত্ত্বের জগতে তা এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১) সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ।

২) ভারতীয় জাতিপ্রথা সংক্রান্ত তত্ত্ব।

৩) গ্রামীন ভারতবর্ষের সমস্যা সম্পর্কিত মতবাদ।

—::—

এস. সি. দুবে (S. C. Dube)

ছিন্দওয়ারা জেলার সিওনিতে ১৯২২ সালে শ্যামাচরণ দুবে জন্মগ্রহণ করেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী পান। সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। ভারত সরকারে "Central Institute of Study and Research in Community Developmeut"—এর তিনি কিছুকাল অধিকর্তা হিসাবে কাজ করেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "ভিজিটিং প্রফেসর" হিসাবেও সম্মানিত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। The Kamar—১৯৫০ সালে প্রকাশিত

২। Indian village—১৯৫৫ সালে প্রকাশিত

৩। India's Changing village : Human Factors in Community Development—১৯৫৮ সালে প্রকাশিত।

৪। Chattisgarh Ke lok-get (হিন্দী) ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

৫। Exploration and Management of Change. (১৯৭১ সালে প্রকাশিত)

৬। Contemporary India and the Modernization (১৯৭৪ সালে প্রকাশিত)

ভারতবর্ষের গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং আচার আচরণ ঐতিহ্যের ওপর গড়ে উঠেছে এবং সেই ঐতিহ্য আজও চলছে। যদিও ভারতবর্ষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে পা ফেলে গড়ে উঠেছে নগর, শহর, বন্দর তবুও ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র এখনো সেই গ্রাম এবং দুবে এই গ্রামীণ ভারতবর্ষের সমস্যা নিয়েই আজীবন গবেষণা করেছেন এবং এখানেই দুবের নিজস্বতা—এখানেই দুবের কৃতিত্ব। দ্বিতীয়তঃ দুবে শুধু মাত্র গ্রামীণ সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা করেই দায়িত্ব এড়িয়ে যান নি, তিনি এই সুত্রে গ্রামীণ পরিকল্পনার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন যার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি কৃষ্টিগত উপাদান এবং অর্থনৈতিক উপাদানের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

চিন্তাধারার ফসল :—

১। সমাজ গঠন এবং গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। অর্থনীতি নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

ইরাবতী কার্ভে (Irabati Karve)

১৯০৫ সালে ইরাবতী কার্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

১। Kinship Organization in India, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত।

২। Hindu Society : An Interpretation, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।

৩। The Social Dynamics of a Growing Town and Its Surrounding Area, ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত

চিন্তাধারার ফসল :—

১। আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত মতবাদ।

কে. এম. কাপাদিয়া (K. M. Kapadia)

নৎসরিতে ১৯০৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন

প্রথমে অধ্যাপক এবং পরে প্রফেসর হিসাবে কে. এম. কাপাদিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন।

১। Hindu kinship, ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত

২। Hindu code, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত

৩। Matrimonial Social Organization of Nagas of Assam, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত

৪। Marriage and Family in India, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত

৫। Industrialization and Rural society (এস. ডি. পিল্লাইয়ের সঙ্গে) ১৯৭২ সালে প্রকাশিত

চিন্তাধারার ফসল :

১। পরিবার এবং বিবাহ সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

২। 'আত্মীয়তার বন্ধন' সম্পর্কিত তত্ত্ব

৩। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ।

রামকৃষ্ণ মুখার্জী (Ramkrishna Mukherjee)

১৯১৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স, হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্লিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যাপনার কাজে জড়িয়ে ছিলেন। "Indian Statistical Institute"-য়ে তিনি সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসেবে দীর্ঘকাল কাজ করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে "Distinguished Scientist"-এর মর্যাদা লাভ করে সমাজতত্ত্বের চর্চা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। ১৯৭২-৭৪ সালে তিনি "Indian Sociological Association"-এর সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৭৪-৭৮ সালে "International Sociological Association"-এর কার্যকর সমিতির সভাপদ লাভ করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

১) "The Dynamics of A Rural Society," ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত।
২) "The Sociologist and social change in India Today," ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত।
৩) "The Rise and Fall of East India Company, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত (৪র্থ সংস্করণ)।
৪) "Social Indicators," ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত।
৫) "Dimensions of Social change in India," ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত।
৬) "Family and Planning in India," ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত।
৭) "Six villages of Bengal," ১৯৭১ সালে প্রকাশিত।
৮) West Bengal Family Structure, ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত।
৯) 'Trends in Indian Sociology,' ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত।
১০) What will It Be ? Explorations in Inductive Sociology, ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত।

১১) 'Sociology of Indian Sociology,' ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল

১) সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত তত্ত্ব।
২) পরিবারের গঠন সম্পর্কিত আলোচনা।
৩) গ্রামীন সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা।
৪) গবেষণা পদ্ধতি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব।
৫) সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা।
৬) ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

এম, এস, গোরে (M. S. Gore)

১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত "Delhi School of social work" এর অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। বোম্বাইয়ের "টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সের" অধিকর্তা হিসাবে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেলয়েট কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। "International Associations of Schools of social work" এর তিনি ছিলেন উপসভাপতি এবং "Accociation of Schools of social work in India"-র তিনি ছিলেন সভাপতি।

১। Social work and Social work Education

২। The Beggar problem in Metropolitan Delhi (সহলেখক) ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত।

৩) Urbanization and Family change (১৯৬৮ সালে প্রকাশিত)

৪) Immigrants and Neighbourhood, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত

৫) Some Aspects of Social Development, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত

চিন্তাধারার ফসল

১। সামাজিক সমস্যা এবং সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত মতবাদ।

২। সমাজ উন্নয়ন এবং পরিবর্তন সম্পর্কয়ি তত্ত্ব

কে. ঈশ্বরণ (K. Iswaran)

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. লিট্, হগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. এস. এবং লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্ ডিগ্রী পেয়ে সম্মানিত হন। ১৯৫৯-৬৪ সাল পর্যান্ত তিনি কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রফেসর হিসাবে এবং বিভাগীয় প্রধান

হিসাবে কাজ করেন। "International Journal of comparative sociology" এবং "The Journal of Asian and African Studies" এর তিনি ছিলেন সম্পাদক। টরেণ্টোর অন্তর্ভূক্ত ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তিনি প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন।

১। Family life in the Netherlands
২। Encounter of cultures
৩। A Study of Foreign Students in Holland.
৪। Shivapur, A village in South India
৫। Essays in Social Sciences (সম্পাদক)
৬। Studies in Social Reconstruction and Social Policy. (সম্পাদক)
৭। International studies in Sociology and Anthropology (সম্পাদক)
৮। Urban Sociology (সহ লেখক)
৯। Introduction to Sociology (সহ লেখক)

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। উন্নয়ন এবং পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

———

এম. এস. রাও (M. S. Rao)

১৯৪৭ সালে এম. এস. রাও মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজদর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান। ১৯৫৩ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে সমাজতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। লণ্ডন, চিকাগো, পেনিসালভেনিয়া, ডিউক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮-১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সোসাইটির সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন।

১। Social Change in Malabar (১৯৫৭ সালে প্রকাশিত)

২। Urbanization and social change (১৯৭০ সালে প্রকাশিত)

৩। Traditions, Rationality and change : Essays on Sociology of Economic Development and Change (১৯৭২ সালে প্রকাশিত)

৪। Urban Sociology in India : Reader and Source book (সম্পাদিত) ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত

৫। Religion and Development in Asian Societies (সম্পাদিত) ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত

৬। Social Movements and Social Transformation.

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। ভারতবর্ষের নগর সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব

২। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব।

যোগিন্দ্র সিং (Yogindra Singh)

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার ম্যাকগিল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বে অধ্যাপনা করার

পর বর্তমানে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের "Centre for the Study of Social system" বিভাগের সমাজতত্ত্বের চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত।

১। Sociology of Non-violence and Peace (সহলেখক)
২। Sociology of Culture in India (সহ সম্পাদক)
৩। Modernization of Indian Tradition : A Systematic Study of Social change, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত।
৪। The Scope and Method of Sociology in India উন্নিথান, যোগিন্দ্র সিং প্রমুখ কর্তৃক সম্পাদিত এবং "Sociology for India"তে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :—

১। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদ।
২। সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত তত্ত্ব।

এ. এম. শা (A. M. Shah)

এ. এম. শা বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। ষ্ট্যানফোর্ড

এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" হিসাবে সম্মানিত হন। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর।

১। The Household Dimension of the Family in India ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত।

২। Historical Sociology : A Trend Report in ICSSR. A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, খণ্ড-১, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল :—

১। পরিবার সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

২। ইতিহাস নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

আন্দ্রে বেতাই (Andre Beteille)

১৯৩৪ সালে বেতাই জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্য্যন্ত Indian Statistical Instituteএ কাজ করেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করেন। আন্দ্রে বেতাই ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সোসাইটির সভ্য এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের প্রফেসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Caste, Class and Power : Changing Patterns of Stratification in Tangore village, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত।

২। Social Inequality : Selected readings, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত।

৩। Studies in Agrarian Social Structure, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

৪। Six Essays in Comparative Sociology, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। ভারতবর্ষে সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রকৃতি

২। গ্রামীণ এবং কৃষক সমাজের গড়ন ও পরিবর্তন।

লীলা দুবে (Leela Dube)

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের ডক্টরেট। বর্তমানে সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Caste Class and Power, "Eastern Anthropologist"এ ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত।

২। Matriliny and Islam, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত।

৩। Sociology of Kinship: A Trend Report in ICSSR: A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology। খণ্ড-২

চিন্তাধারার ফসল:

১। 'আত্মীয়তার বন্ধন' সম্পর্কিত তত্ত্ব।

২। সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত তত্ত্ব।

ভিক্টর ডি' সুজা (Victor D' Souza)

কর্ণাটক, পুণা এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন ভিজিটিং প্রফেসর।

বর্তমানে তিনি চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করছেন। "Social Action" জার্ণালের তিনিই সম্পাদক।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। The Navayats of Kanara (A study in cultural contact) ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

২। Social Structure of a Planned City—Chandigarh ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত।

৩। 'Urban studies', A Trend Report in ICSSR. A

Survey of Research in Sociology and Social Anthropology. প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। ভারতবর্ষে নগর সমস্যা সম্পর্কিত মতবাদ।

বি. আর. চৌহান (B. R. Chouhan)

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। উদয়পুরের এম. বি. কলেজে কিছুকাল সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজ করেন। সগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন। অতঃপর আগ্রার "Institute of Social Sciences"-এ রীডার হিসাবে কাজ করেন। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "General Fellow of the Population Council" হিসাবে সম্মানিত হন। উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তিনি ছিলেন প্রধান। অবশেষে মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের "Institute of Advanced Studies" এর সমাজতত্ত্বের প্রফেসর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। A Rajasthan Village, ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত।

২। Towns in Tribal Setting ১৯৭০ সালে প্রকাশিত।

৩। Rural Studies : A Trend Report, in ICSSR.

A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব

সুরজিৎ সিংহ (Surajit Singha)

১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কলকাতা, চিকাগো এবং ডিউক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে সম্মানিত হন। বেশ কিছুকাল "Anthropolgical survey of India"র অধিকর্ত্তা হিসেবে কাজ করেন। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সোসাইটির তিনি ছিলেন সভাপতি। 'Man in India' পত্রিকাটির তিনিই সম্পাদক। বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। Ethnie groups, Villages and Towns in Papgana Barabhum (১৯৬৫ সালে প্রকাশিত)

২। Science, Technology and Culture (১৯৭০ সালে প্রকাশিত।

৩। Sociology of Religion : A Trend Report in ICSSR. A Survey of Research in Sociology

Survey of Research in Sociology and Social Anthropology. প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ

১। ভারতবর্ষে নগর সমস্যা সম্পর্কিত মতবাদ।

বি. আর. চৌহান (B. R. Chouhan)

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। উদয়পুরের এম. বি. কলেজে কিছুকাল সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজ করেন। সগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন। অতঃপর আগ্রার "Institute of Social Sciences"-এ রীডার হিসাবে কাজ করেন। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "General Fellow of the Population Council" হিসাবে সম্মানিত হন। উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তিনি ছিলেন প্রধান। অবশেষে মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের "Institute of Advanced Studies" এর সমাজতত্ত্বের প্রফেসর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। A Rajasthan Village, ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত।

২। Towns in Tribal Setting ১৯৭০ সালে প্রকাশিত।

৩। Rural Studies : A Trend Report, in ICSSR.

A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমস্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব

সুরজিৎ সিংহ (Surajit Singha)

১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কলকাতা, চিকাগো এবং ডিউক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে সম্মানিত হন। বেশ কিছুকাল "Anthropolgical survey of India"র অধিকর্ত্তা হিসেবে কাজ করেন। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সোসাইটির তিনি ছিলেন সভাপতি। 'Man in India' পত্রিকাটির তিনিই সম্পাদক। বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। Ethnie groups, Villages and Towns in Papgana Barabhum (১৯৬৫ সালে প্রকাশিত)

২। Science, Technology and Culture (১৯৭০ সালে প্রকাশিত।

৩। Sociology of Religion : A Trend Report in ICSSR. A Survey of Research in Sociology

and Social Anthropology (২য় খণ্ড)

৪। Cultural Profile of Calcutta (সম্পাদিত)

চিন্তাধারার ফসল ঃ—

১। আদিবাসী সমস্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব।

২। অর্থনীতি নির্ভর নৃতাত্ত্বিক মতবাদ।

৩। "ভদ্রলোক এবং ছোটলোক" প্রত্যয়।

—)::(—

পরিশিষ্ট—(ক)

যে সব গ্রন্থ হ'তে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ—

১। "Origins and Growth of Sociology," আব্রাহাম কর্তৃক লিখিত এবং পেঙ্গুইন বুকস্ লিমিটেড কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত।

২। "Contemporary Sociological Theories," পিটিরিম্ এ. সোরোকিন কর্তৃক লিখিত এবং হারপার এণ্ড রো' কর্তৃক ১৯২৮ সালে প্রকাশিত।

৩। "Sociological Theory: its Nature and Growth," নিকোলাস এম. টিমাসেফ্ কর্তৃক লিখিত এবং র‍্যাণ্ডাম হাউস কর্তৃক ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত।

৪। "The Nature and Types of Sociological Theory," ডন মার্টিনডেল কর্তৃক লিখিত এবং রাউটলেজ এণ্ড কেগান পল কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।

৫। "An Introduction to the History of Sociology," এইচ. ই. বারনেস্ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ইউনিভার্সিটি অব্ চিকাগো প্রেস কর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত।

৬। "Main Current in Sociological Thought," রেমণ্ড অ্যারণ কর্তৃক লিখিত এবং উইডেনফেল্ড এণ্ড নিকলসন্ কর্তৃক ১৯৬৫-৬৮ সালে এবং পেঙ্গুইন বুকস্ কর্তৃক ১৯৬৮-৭০ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত।

৭। "Hundred Years of Sociology," ডান্‌কান্ মিচেল কর্তৃক লিখিত।

৮। "A General Introduction to Sociology," গাই রচার কর্তৃক লিখিত।

৯। "Systematic Sociology," কার্লম্যানহাইম্ কর্তৃকলিখিত।

১০। 'Sociology,' বটোমোর কর্তৃক লিখিত।

১১। The Principles of Sociology,' হারবার্ট স্পেনসার কর্তৃক লিখিত।

১২। 'The Principles of Sociology,' ফ্র্যাঙ্কলিন গিডিংস কর্তৃক লিখিত।

১৩। International Encyclopaedia of Social Sciences (সমস্ত খণ্ড হইতে কিছু না কিছু সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

১৪। 'Trends in Indian Sociology,' রামকৃষ্ণ মুখার্জী কর্তৃক লিখিত।

১৫। A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, ICSSR কর্তৃক প্রকাশিত।

১৬। "মার্কস—এঙ্গেলস—মার্কসবাদ," লেনিন কর্তৃক লিখিত।

১৭। "The Communist Manifesto," মার্কস এবং এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত।

১৮। "ধূর্জটীপ্রসাদ," অলক রায় কর্তৃক লিখিত।

১৯। "বাংলার বিদ্বৎসমাজ," বিনয় ঘোষ কর্তৃক লিখিত।

২০। History of Sociological Thought : Western and Indian—A Glossary," (পাণ্ডুলিপি), সমীর দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত।

২১। "Sociology in India," বেলা দত্তগুপ্তা কর্তৃক লিখিত। এবং "Centre for Sociological Research" থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত।

২২। "Greetings to Young Indin" (Part—I), বিনয় কুমার সরকার কর্তৃক লিখিত।

২৩। "Sociology of Indian Sociology," রামকৃষ্ণ মুখার্জী কর্তৃক লিখিত।

২৪। "Orgin and Developmend of Sociology in India—A Brief Review," সমীর দাশগুপ্ত ও জে. রায়চৌধুরী কর্তৃক লিখিত এবং "The Calcutta Review" (খণ্ড ৫, সংখ্যা ৩+৪, ১৯৮০) তে প্রকাশিত।

২৫। "The Teaching of Sociology, Social Psychology and Anthropology," জি. এস. ঘুরিয়ে কর্তৃক লিখিত।

২৬। "Cultural Heritage of India," রাধাকৃষ্ণান কর্তৃক সম্পাদিত।

২৭। "Report on the Status of Teaching of Sociology and Social Anthropology," U. G. C. কর্তৃক প্রকাশিত।

২৮। "The Philosophy of Social Science," রাধাকমল মুখার্জী কর্তৃক লিখিত এবং ম্যাকমিলান্ কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত।

প্রত্যয় সম্পর্কিত শব্দকোষ ঃ—

অধঃক্ষেপ — Residues.
অতীন্দ্রিয়বাদ — Mysticism.
অনুকরণ — Imitation.
অপরাধ — Crime.
অপবিত্র — Profane.
অলৌকিক শক্তি — Supernatural Power
আধিবিদ্যক — Metaphysical.
আধুনিকতা — Modernity.
আত্মহনন — Suicide.
আমলাতন্ত্র — Bureaucracy.
আত্মীয়তার বন্ধন — Kinship.
আচরণ — Behaviour.
আইন — Law.
আদর্শভিত্তিক নমুনাতত্ত্ব — Ideal type concept.
ইচ্ছা — Will.
ঐতিহ্য — Tradition.
ঐতিহ্যভিত্তিক কর্তৃত্ব — Traditional authority.
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — Historical materialism.
কৃষ্টি — Culture.
কার্যনির্ভর তত্ত্ব — Functional theory.
কূটনীতিজ্ঞ — Diplomat.
গঠন নির্ভর তত্ত্ব — Structural theory.
গুণগত চরিত্র — Qualitative character.

গতিময় সমাজতত্ত্ব — Dynamic Sociology.
গবেষণা পদ্ধতি-বিজ্ঞান — Research methodology.
গুণনির্ভর সংহতি — Organic Solidarity.
গোষ্ঠী — Group.
গোত্র — Clan.
চেতনা — Rationality.
জনসংখ্যান — Demography.
জৈবিক বিবর্তন — Organic evolution.
জ্ঞানতত্ত্ব — Epistomology.
জনমত — Public opinion.
তুলনামূলক পদ্ধতি — Comparative method.
দর্শননির্ভর সমাজতত্ত্ব — Philosophical Sociology.
দৃষ্টবাদ (প্রত্যক্ষবাদ) — Positivism.
দৃষ্টবাদ সম্পন্ন জৈবিক মতবাদ — Positivistic Organicism.
দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব — Dialectical theory.
দ্বিগুণ মিশ্র সমাজ — Double Compound Society.
দমনমূলক আইন — Repressive law.
দাসত্ব — Slavery.
ধর্ম নিরপেক্ষতা — Secularism.
ধারণা — Idea.
নিয়ন্ত্রণ — Regulation or Control.
নিবৃত্তমূলক আইন — Restitutive law.
নিরাপত্তা — Security.
নৃতত্ত্ব — Anthropology.
নৈতিক আইন — Moral Code.
প্রকল্প — Hypothesis.

প্রাকৃত বিজ্ঞান — Natural Science.
প্রাকৃতিক নির্বাচন — Natural Selection.
প্রগতি — Progress.
পরিবার — Family.
পারস্পরিক বিনিময় — Mutual reciprocity.
প্রযুক্তি — Technology.
জাতিতাত্ত্বিক ঐতিহ্য — Ethnological tradition.
প্রতিষ্ঠান — Organization.
প্রজাতির চেতনা — Consciousness of kind
প্রবৃত্তি — Instinct.
প্রচলিত রীতি — Custom.
পবিত্র — Sacred.
প্রভুত্ব — Mastery.
পুঁজি — Capital.
বণ্টন — Distribution.
বহুমুখীতা — Multiplicity.
ব্যক্তিত্ব — Personality.
ব্যক্তিত্ব নির্ভর কর্তৃত্ব — Charismatic authority.
ব্যুৎপত্তি — Derivation.
বিপ্লব — Evolution-
বৃত্তাকার সমাজ পরিবর্তন — Cyclical Social Change
বিশ্বকোষ — Encyclopaedia.
বাহ্যিক শক্তি — External Constraint.
বাচনিক প্রমাণ — Verbal Proof.
ব্যক্তিগত মালিকানা — Private ownership.
ভারসাম্য — Equilibrium.
ভাববাদ — Ideology.

ভূমিকা — Role.
ভরণপোষণ — Sustenance.
মনুষ্যত্ব সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব — Sociology of humanity.
মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব — Marxist Sociology.
মূল্যবোধ — Values.
মনোভাব — Attitude.
মর্য্যাদা ও চুক্তি — Status and Contract.
মুক্তি — Liberty.
মূল্যবোধের বিচার — Value Judgement.
যোজনা এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব — Sociology of Planning and Developmeut.
যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব — Mechanistic theory.
যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ব্যবহার — Logical and non-logical behaviour.
যুক্তিনির্ভর কর্তৃত্ব — Rational authority.
যাদুবিদ্যা — Magic.
যুক্তি — Rationality.
যুক্তিসিদ্ধ সমাজ — Rational Society.
রীতিসিদ্ধ সমাজতত্ত্ব (লৌকিক সমাজতত্ত্ব) — Formal Sociology.
রীতিনির্ভর সংহতি (যুতসিদ্ধ) — Mechanical Solidarity.
রক্ষনশীলতা — Conservatism.
শখ — Fad.
শাসন এবং সংস্কার সম্পর্কিত ঐতিহ্য — Administrative and Reformative tradition.
শ্রেণী সংগ্রাম — Class Struggle.
শিল্পায়ন — Industrialization.

শ্রমবিভাজন — Division of labour.
সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব — Sociology of Reform.
সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব — Sociology of Social change.
সামাজিক সমীক্ষা সম্পর্কিত ঐতিহ্য — Social Survey tradition.
সংঘাত সম্পর্কিত তত্ত্ব — Conflict theory.
সম্প্রদায় — Community.
সমিতি — Association.
সামাজিক ঘটনা — Social fact.
সামগ্রিক বিবেকবোধ — Collective Conscience.
সরল সমাজ — Simple Society.
সমাজ পরিবর্তন — Social Change.
সামাজিক হেতুবাদ — Social Causation.
সামাজিক গড়ন — Social Structure.
সামাজিক প্রত্যয় — Social Concept.
সামাজিক ধারা — Social order.
সামাজিকীকরণ — Socialization.
সামাজিক পদ্ধতি — Social system.
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ — Social Control.
সামাজিক অরাজকতা — Social Crisis.
সামাজিক পদার্থবিদ্যা — Social Physics
সামাজিক সম্পর্ক — Social interaction.
সামাজিক পাপ — Social Vice.
সামাজিক অবস্থা — Social Condition.
সামাজিক মন — Social mind.

সামাজিক উপাদান	—	Social factor.
সামাজিক প্রজাতি	—	Social kind.
সামাজিকতা	—	Sociability.
সামাজিক স্তরবিন্যাস	—	Social Stratification.
স্থিতি সমাজতত্ত্ব	—	Static Sociology.
সংকটপূর্ণ যুগ	—	Critical era.
সংসদীয় অভ্যুত্থান	—	Parlamentarianism.
স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছা	—	Voluntary will.
সমষ্টিগত মালিকানা	—	Collective ownership.
সাধারণ সমাজতত্ত্ব	—	General Sociology.
সমতা	—	Equality.
সংঘাত	—	Conflict.
সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কিত তত্ত্ব	—	Social behaviourism
সভ্যতা	—	Civilization.
সমাজ উন্নয়ন	—	Social development
সর্বহারা	—	Proletariat.
সংহতি	—	Solidarity.
ক্ষমতাশালীর চক্রবৎ আবর্তন	—	Circulation of elite.
ভ্রম চেতনা	—	False conciousness

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	জেমসও	জেমস্ ও'
১৯	সুবিনস্ত	সুবিন্যস্ত
১৯	লৌকিক সমাজতত্ত্ব :—	চিন্তাধারানিষ্ঠ প্রত্যয়
	ক) চিন্তাধারানিষ্ঠ প্রত্যয়	ক) লৌকিক সমাজতত্ত্ব
৪২	প্রযুক্তিবিদগণের	প্রযুক্তিবিদ্‌গণের
৪৫, ৪৬	দ্বান্দিকতত্ত্ব	দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব
৪৭	অপত্রিহার্য্য	অপরিহার্য্য
৬৯	"কার্যনিষ্ট সম্পর্কিত''	"কার্যনিষ্ঠ সম্পর্কিত
৭০	বেসকারী	বেসরকারী
৭০	পদপর্য্যাদার	পদমর্য্যাদার
৭১	সেইসব	সেই সব'
৭৭	সহমরন	সহমরণ
৮৮	উপোরক্ত	উপরোক্ত
১০০	কর্ত্তপক্ষের	কর্তৃপক্ষের
১১০	অর্থনৈতিকনিষ্ঠ	অর্থনীতিনিষ্ঠ
১৭৭	জাতীর	জাতির
১৮৯	উয়িড়ষ্যা	উড়িষ্যায়
২০৩-২০৫	রূপান্তরীত	রূপান্তরিত
২১৫	জড়াজীর্ণ	জরাজীর্ণ
১৯৯	মূল:বাধকে	মূল্যবোধকে
২৬০	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
২৭১	কেন্দ্রিভূত	কেন্দ্রীভূত
২৮৯	Ethnie	Ethnic
২৯৬	প্রভূত্ব	প্রভুত্ব
২৯৭	Developmeut	Development

- এছাড়া যেখানে "ধরন" শব্দটি রয়েছে তার সঠিক বানান হবে "ধরণ" এবং যেখানে "অনুদিত" শব্দটি রয়েছে তার সঠিক বানান হবে "অনূদিত।